— লিখেছেন —

শ্রীনরেন্দ্র দেব শ্রীঅখিল নিয়োগী শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ; শ্রীবিমল ঘোষ: শ্রীহাসিরাশি দেবী শ্রীপ্রভাকর মাঝি ; শ্রীঅমলেন্দু সেন শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র শ্রীআদিত্য ওহদেদার ; শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ ; শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ; শ্রীসত্যব্রত বসু ; শ্রীশান্তশীল দাশ; শ্রীজীবন ভৌমিক শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত শ্রীরবিদাস সাহা রায় ; শ্রীমণীষ বসু ; শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য শ্রীক্ষিতীশ সাঁতরা শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী শ্রীসুনীল সরকার শ্রীসঞ্জিত ধর শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায় ও মৌমাছি।

— ফটো তুলেছেন —

শ্রীরেবন্ত ঘোষ শ্রীরেখা সেন শ্রীকল্যাণ সরকার ও শ্রীঅনিল দত্ত।

— ছবি এঁকেছেন —

শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ শ্রীবিমল দাস শ্রীনারায়ণ দেবনাথ শ্রীঅহিভূষণ মালিক; শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,

বসন্তকাল এল বটে—শীত পালাবার পরে
কিন্তু হঠাৎ ঘুচল আলো—অকাল-বাদল ঝরে!
মরল অনেক আধফোটা ফুল—ঝরলো মুকুলগুলি,
মন-মুখ সব কালো হলো—রক্তে পিছল ধূলি।
অনেক আশায় দোলনা বেঁধে—কমজোরী সব ডোরে
দুলতে গিয়ে ধুলোয় পড়ে—সবার মাথাই ঘোরে।
অনিশ্চিতের ভাবনা-ভয়ে দেশের আকাশ জোড়া
রং ছেড়ে সব সং সেজে তাই—চালায় কাদা ছোঁড়া!
এবার দোলে এমনতরো উল্টো পরিবেশে
ভয় পেয়ো না—মনটি রাঙাও দেশকে ভালোবেসে।
নতুন আশার দোলায় দোলাও তোমরা সবার মন,
বসন্তকে স্থায়ী করার চাই যে আয়োজন
কিশোর মনের প্রীতির রঙে ঘুচুক ভয়-ভীতি
সবার শুভকামনা সেই—আমার দোলের গীতি।

তোমাদের—
মৌমাছি

রাখে প্রাণ মারে কে?

শ্রীনরেন্দ্র দেব

এক মস্ত ধনী মানুষ ছিলেন। তাঁর ধনরত্ন টাকাকড়ির শেষ ছিল না। গাড়ি-বাড়ি, তালুক-মুলুক, জমি-জিরেতে দেশের প্রায় সবটাই তিনি কিনে রেখেছিলেন।

তাঁর হল একবার এক কঠিন রোগ। রোগ থেকে তাঁকে সারিয়ে তুলবার জন্যে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সারা দেশের যত ভালো ভালো ডাক্তার-বদ্যি ছিল, সব্বাইকে এনে জড় করা হল তাঁর বিছানার পাশে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কেউই তাঁর অসুখ সারাতে পারলেন না। তখন শেষ চেষ্টা করতে দেশ-দেশান্তরে যত সাধু-সন্ন্যাসী ছিল, তাঁদের নিয়ে আসা হতে লাগলো। তাঁরা অনেক জপতপ যাগযজ্ঞ করলেন। জলপড়া, তেলপড়া, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক করলেন। কিছুতেই কিচ্ছু হলো না।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তাঁর মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। এমন সময় এক তান্ত্রিক-যোগী এসে হুংকার দিয়ে বললেন—আমি আয়ুহীন মানুষকে বাঁচাতে পারি, যদি তোমরা একটি ব্রাহ্মণ বালক যোগাড় করে এনে দিতে পার। তার আয়ু আমি একে দিয়ে বাঁচিয়ে তুলব। কিন্তু সেই ছেলেটিকে মরতে হবে। জেনে রাখো, তাকে লুকিয়ে চুরি করে আনলে চলবে না। তার পিতা-মাতার সম্মতি চাই। তার প্রাণের বদলে এঁর প্রাণ জিইয়ে তোলা হবে।

ধনী পুরুষের আত্মীয় বন্ধুরা তখুনি গ্রামে গ্রামে ছুটলো ব্রাহ্মণ বালকের সন্ধানে। নানা জায়গায় সন্ধান করার পরে পেয়েও গেল তারা একটি বারো বছরের ছেলে। অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। তাদের আটটি ছেলে সাতটি মেয়ে। তারা পরিবারসুদ্ধ সবাই অনাহারে মৃত্যুমুখী। ধনী পুরুষের আত্মীয়-বন্ধুরা পাঁচটি গ্রাম আর নগদ বহু টাকা তাদের দেবে বলায় তারা ভেবে দেখল, সব কটি ছেলেমেয়ের অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে একটি ছেলের বদলে সব কটিকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের মানুষ করা যাবে। নিজেরাও শেষ জীবনে কিছুটা সুখে আরামে কাটাতে পারবে। এই রকম চিন্তা করে সেই ব্রাহ্মণ পিতামাতা তাদের একটি ছেলেকে দিয়ে দিল।

বালক তো পাওয়া গেল। তান্ত্রিক তখন বললেন,—দেশের শাসনকর্তার অনুমতি চাই। নইলে এই বালককে হত্যার অপরাধে আমার প্রাণবধের আদেশ আসবে।

রাজ্যের শাসনকর্তার অনুমতি পেতে বেশী অসুবিধে হলো না। তিনি সেই ধনী পুরুষের কাছে বহু টাকা ঋণ করে সেই ঋণে একেবারে ভরাডুবি হয়ে বসেছিলেন। এই অনুমতি দিলে তিনি সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হবেন বলায় তিনি অনুমতি দিলেন।

ব্রাহ্মণ ছেলেটি এইসব ব্যাপার দেখে ভয় পাওয়া দূরে থাক, খিলখিল করে হাসতে লাগলো। তার হাসি দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুমি হাসছো কেন? তোমার কি মৃত্যুভয় নেই?

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে—এখন আমার প্রাণের বদলে এই ভদ্রলোক বাঁচলেও শেষ পর্যন্ত এঁকে কিন্তু মরতেই হবে। কিছু আগে যাচ্ছিলেন, কিছু পরে যাবেন। আমাকেও কোনও একদিন মরতেই হবে,—আমি কিছুটা না হয় আগেই যাবো। এই পৃথিবীতে থেকে এই সব দেখা আর জানার চেয়ে চটপট তাড়াতাড়ি সরে যাওয়াই ভালো ভেবে আমি হাসছি। যেখানে বাবা-মা নিজেদের সুবিধে আর স্বার্থের হিসেব করে অসহায় সন্তানের প্রাণ বিক্রি করে দেন—যেখানে বিচারকর্তা ন্যায়ধর্ম ভুলে নিজের স্বার্থ সুবিধের লোভে অন্যায়কে সমর্থন করেন—যেখানে যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এমন একজন মানুষ, নিজের আয়ু বাড়াবার জন্যে ধনবলের সাহায্যে একটি কাঁচা বয়সের প্রাণকে নষ্ট করতে প্রস্তুত হন—সে পৃথিবীর মধ্যে থেকে লাভ নেই। হাসছি আমি—অর্থকে মানুষ কোথায় কেমন করে ব্যবহার করে দেখে—আর স্নেহ মায়া মমতার মূল্য কেমন—বিচারধর্মের মূল্য কেমন, এই সমস্ত দেখে।

ধনী লোকটি এই কথা শুনে খুব কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি চোখের জল ফেলে বললে—আমি এই সুন্দর প্রাণটি নষ্ট করে নিজে বাঁচতে চাই না। আমার প্রাণের চেয়ে এ প্রাণ অনেক দামী। ছেলেটিকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—বাবা, তোমাকে খুন করে আমি বাঁচতে পারব না। আমার সমস্ত সম্পত্তি আর ধনরত্ন সব আমি তোমাকেই দানপত্র লিখে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি পরম সুখে বেঁচে থাকো।

বালকটি তাঁকে প্রণাম করে বললে—আপনিই এখন আমার জীবনের মালিক—আমার বাবা-মা নয়। আমি আপনার কাছে থেকে আপনাকে সেবা করে সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করব। আত্মীয়-বন্ধু, ডাক্তার-বদ্যি, সাধু-সন্ন্যাসী এদের সব্বাইকে যেতে বলুন। দেখি, আমি আপনাকে সুস্থ করতে পারি কি না।

ছেলেটির এই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। তার সেবায় সেই ধনী-বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

তান্ত্রিক যোগী হুংকার দিয়ে বললেন—আমি আয়ুহীন মানুষকে বাঁচাতে পারি

চড়কডাঙার চরকী-পিসী

শান্তশীল দাশ

চড়কডাঙার চরকী পিসী চরকী নিয়ে ঘোরে,
ভোর না হলে ছুটল ট্রেনে
শিয়ালদহের মোড়ে;
ঘণ্টাখানেক পরে আবার পৌঁছলো বাগমারী,
একটু পরেই দেখবে তাকে
চলল নাতির বাড়ি
আলমবাজার, সেখান থেকে মিনিট কুড়ি পরে
আবার পিসী হাঁটতে থাকে
নাগেরবাজার ধরে,
নাগেরবাজার বোনের বাসা,
দেখতে যাওয়া চাই,
দেখাশোনা করেই মনে পড়লো, আছে ভাই
নাকতলাতে, অমনি ট্রামে উঠল তাড়াতাড়ি—
ভাইকে দেখে ফিরল বুঝি
এবার পিসী বাড়ি?
আরে না-না, তখন মোটে বিকেল হল সবে,
এবার পিসীর সই-এর বাড়ি
যেতে ঠিকই হবে:
সই থাকে ভাই বাগবাজার খালের পাড়ে ঘর,
সইয়ের সাথে দু-চার কথা বলেই অতঃপর
পড়বে মনে হয়তো পিসীর
ভাসুরপো-এর নাম,
অমনি তাকে ছুটতে হবে "শ্রীগোবিন্দধাম",
কাঁকুড়গাছি; রাত্রি তখন দশটা বেজে ষোল,
আর না, এবার পিসীর বাড়ি
ফেরার সময় হল।

ফুলদল খেলে হোলি

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

[শীতের শেষ। একটি বনের গাছ লতা পাতা শীতের প্রকোপে সব শুকিয়ে গেছে। ঝরা পাতা জড় করে নিয়ে শীত-বুড়ী আগুন জেবলে কাঁথা গায় দিয়ে দিব্যি আরামে গুন-গুন করে গান গাইছে]

[শীতবুড়ীর গান]

ঝরা পাতায় আগুন জেবলে
ছেঁড়া কাঁথা গায়—
আনন্দেতে গান যে গাহি—
আমায় কে আর পায়!
এ বনে আর নেই ত কুসুম—
শুকনো পাতায় লাগলো যে ধুম—
অন্ধকারে কাল-প্যাঁচারা এদিক-
ওদিক চায়॥

[শীতবুড়ী আপনমনে হাততালি দিচ্ছে, শুকনো পাতা গুঁজে দিচ্ছে আগুনে, আর ছেঁড়া কাঁথাটা দিয়ে গা ঢেকে নিচ্ছে। এমন সময় নীল পোশাক পরা একটি মেয়ে এসে বনভূমিতে নাচ-গান সুরু করল]

[দখিন-হাওয়ার গান]

আমি এলাম দখিন হাওয়া
ঝরা ফুলের পাশে
তাইত' দেখি বনের কুসুম
নয়ন মেলে হাসে।
ধরল কুঁড়ি পলাশ শাখে—
কনক চাঁপা সবায় ডাকে—
ফুলের বনের আলোতে যে ছোঁয়া
সকল আঁধার নাশে॥

শীতবুড়ী আগুন জেবলে কথা গায় দিয়ে গুন গুন করে গান গাইছে

শীতবুড়ী॥ এ ত' বড় ঝঞ্ঝাটের কথা হল দেখছি—! দিব্যি 'ওম' পাচ্ছিলাম আগুনের ধারে, তুমি আবার কে এসে নাচ-গান শুরু করলে?

দখিন হাওয়া॥ বা—রে শীতবুড়ী, তুমি দখিন হাওয়াকে চেন না? ফুর ফুর করে গান গাইতে গাইতে আর নাচের হিল্লোল তুলে আমি চলে এলাম এই বনে। এইবার শীতের পালা চুকলো। বসন্তরাণী তাঁর চরণ ফেলেছেন এই বনভূমির দিকে—

শীতবুড়ী॥ কী অলক্ষণে কথা গো! বসন্তরাণীর এখানে আসবার কি দরকার? শুকনো পাতার আড়ালে এই নিঝুম বন ত' বেশ আরামে আর আয়েসে 'ওম' নিয়ে দিব্যি আগুন পোয়াচ্ছে! তুমি বা আর ঝুট-ঝামেলা শুরু কোরোনা, এখান থেকে সরে পড়ো—

দখিন হাওয়া॥ সে কি গো শীতবুড়ী, আমি খবর দিতে এসেছি—নানান রঙের ফুল ফুটবে এই কাননে, আর বসন্তরাণী সেই ফুলের রঙ দিয়ে হোলী খেলবেন। আর সেই কথা জানাতেই ত' আমার আসা—

শীতবুড়ী॥ এ ত' বড় গোলমেলে কথা হল! দেখছি সব এলোমেলো করে দেওয়াই দখিন হাওয়ার কাজ।

[নাচতে নাচতে সোনালী কনক চাঁপার প্রবেশ ও নৃত্যগীত]

কনক চাঁপা॥ ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ। দখিন হাওয়ার পরশ পেয়েই ত' আমি কনক চাঁপা ফুটে উঠলাম। আমার সোনালী রঙ আমি বসন্তরাণীর পায়ে উজাড় করে ঢেলে দেব—

[কনক চাঁপার গান]

নামটি আমার কনক চাঁপা—
দখিন হাওয়া পরাণ কাঁপা—!
এই কাননে গড়বো আমি কনক কুঁড়ি
বাসন্তিকা আসবে কনক মুকুট পরি—
নতুন তালে ছন্দে আমার চরণ মাপা—
নামটি আমার কনক চাঁপা॥

[বনের আর এক কোণ থেকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলো রক্ত জবা। রক্ত জবা গান ধরল]

রক্ত জবা আপন রঙে আপনি সাজি—
আমায় নিয়ে ভরবে কি গো ফুলের সাজি!
অরুণ কিরণ লাগলো গালে—
তাই ত' নাচি ছন্দে তালে—
রক্তলালে গাঁথব আমার মালা গাছি॥

দখিন হাওয়া॥ আমি দখিন হাওয়া,—ডাক দিয়ে যাই তোমাদের এই কাননে। নানা রঙের ফুলেরা ফুটে ওঠো। তোমাদের নানা রঙের মালা নিয়ে বসন্তরাণী হোলী খেলবেন। ফুলের রঙে রাঙা হবে—কানন আর গগন। এসো, এসো সবাই—হোলী খেলার শুভলগ্ন বয়ে যায়—

[নাচতে নাচতে নীলরঙের অপরাজিতার প্রবেশ। কণ্ঠে তাঁর সুন্দর সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠছে। চরণে নূপুর বাজছে রিনি ঝিনি]

[অপরাজিতার গান]

নীল গগনের সঙ্গে আমার মনের মিতালি—
তাই ত' সুনীল রঙটি মেখে শোনাই গীতালী!
বসন্তেরই আসবে রাণী
নীলে নিজেই ধন্য মানি
বনের বিহগ দলে শোনায় আজকে কি তালই॥

[এইবার কচি সবুজ পাতার দল এগিয়ে এলো নাচতে-নাচতে গাইতে গাইতে। তাদের আগমনে বনভূমি যেন সবুজ উঠল। একটা সবুজ আলোর ঢেউ যেন বয়ে গেল চারদিকে]

[সবুজ পাতাদের গান]

আমরা সবাই সবুজ পাতা বনকে
সবুজ করি—
কচি-সবুজ পতাকাকে গগন পানে ধরি!
বনের পাখিই বাঁধবে বাসা—
সঙ্গে তাদের সুর যে খাসা—
সবুজ-পরী!
আমরা যেন সবুজ বনে হাজার
সবুজেরই বন্যা এনে ধন্য করি বন—
বাসন্তিকা তাই ত' দেখি হেথায়
উদয় হন—!
হালকা সবুজ পাখনা ছড়াই
প্রাণ সবুজের মধুর বড়াই—
নীল-গগনে আমরা যেন ভাসাই
সবুজ-তরী॥

[সবুজের নাচে গানে বনভূমি সবুজ হল]

শীতবুড়ী॥ তাইত' এ যে মহা আপদ হল ওরা! ফুল ফুটতে শুরু করেছে! আমার আগুন পোয়ানো তাহলে বন্ধ হল এবার। আমার ছেঁড়া কাঁথা গুটিয়ে এইবার মানে-মানে সরে পড়ি।

[শীতবুড়ীর প্রস্থান]

[কাননে-কান্তারে যেন রঙের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে বসন্তরাণী বাসন্তিকরা নৃত্য-

বনের চারদিকে ফুল ফুটতে লাগলো

গীতে সারা প্রকৃতি সুর ও ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল]

[বাসন্তিকার গান]

বাসন্তিকা এলাম আমি সবার ডাকে—
লাল নীল আর কনক-কুসুম ফুটেছে
লাখে লাখে!
রঙ মিশিয়ে সবার সাথে—
হোলী খেলায় পরাণ মাতে
শ্বেত পারাবত যোগ দিল যে
শাখে শাখে!
রঙের খেলা প্রাণের খেলা হোলীর
দিনে
চেনা সুরের মূর্চ্ছনা যে সুরের বীণে!
আয়রে অলস ঘুম-কাতুরে—
বাঁধবো সবায় মধুর সুরে—
ভালোবাসায় সকল জনায় আনবো
জিনে—
বাসন্তিকা এলাম আমি সবার ডাকে

[বনের চারদিকে নানা রঙের ফুল ফুটতে লাগলো। আলোর খেলায় মেতে উঠল

(শেষাংশ—পরের পাতায়)

গাছের পাতার কঙ্কাল

পরিতোষকুমার চন্দ্র

গাছের ডালে ডালে পাতার গুচ্ছ যখন বাতাসে দোলে, তখন তা দেখতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগে, কিন্তু সেই পাতা যখন পেকে হলদে হয়ে গাছের তলায় ঝরে পড়ে, তখন কেউই সেগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখো না। ঝরে পড়া এই সব পাতার মধ্যে যে সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে, তা যারা দেখেনি তারা অনুমান পর্যন্ত করতে পারবে না। পাতার ভেতরের যে সৌন্দর্যের কথা বলছি, সেটা হলো তার কঙ্কাল। ঝরে পড়া পাতা রোদে শুকিয়ে ও বৃষ্টির জলে পচে যখন তার শিরা-উপশিরাগুলো বেরিয়ে পড়ে, তা দেখতে সবুজ কচি পাতার চেয়ে কম সুন্দর নয়।

প্রকৃতির প্রভাবে পাতার কঙ্কাল তৈরি হতে খুবই দীর্ঘদিন লাগে। তারপর তা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় না বললেও চলে। আর অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেলেও তা এমন ক্ষণভঙ্গুর থাকে যে, সামান্য আঘাতেই ভেঙে যায়। সামান্য কিছু কাজ করে তোমরাই যদি পাতার কঙ্কাল তৈরি করো, তবে সেটা অক্ষত তো থাকবেই, উপরন্তু সেটা দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে। নানা আকারের পাতার কঙ্কাল তৈরি করে কালো কাগজের ওপর আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিলে সেগুলো কতখানি যে সুন্দর দেখতে হয়, তা না দেখলে বোঝানো যায় না। এই লেখার সঙ্গে অশ্বত্থ পাতার কঙ্কালের যে ছবিটা দেওয়া হলো, সেটা দেখলেই বুঝবে আমার কথা সত্য কিনা।

পাতার কঙ্কাল যদি করতে চাও, তবে তোমার ইচ্ছা মতো বিভিন্ন গাছের কয়েকটা পাতা যোগাড় করো। যে সব পাতা পেকে হলদে হয়ে গেছে, এই রকম পাতাই নেবে। তবে সব গাছের পাতা থেকে কঙ্কাল বের করা যায় না। যে সব পাতার শিরা-উপশিরা মোটা ও শক্ত সেই সব পাতাই এই কাজের উপযুক্ত। অশথ, বট, কালো জাম, জামরুল, আম ও লিচু পাতা থেকেই কঙ্কাল ভালো হয়। এগুলোর মধ্যে আবার অশথ পাতার কঙ্কালই সব চেয়ে ভালো হয় এবং দেখতেও সুন্দর হয়

এবার কিছুটা কলি চুন যোগাড় করে একটা এনামেল পাত্রে রেখে কিছু জল দিয়ে ঘেঁটে দাও। তারপর অন্য একটা বড় পাত্রে, যেমন কড়াই বা সসপ্যানে, খানিকটা জল ঢেলে পাত্রটা আগুনে চড়িয়ে দাও ও তার ওপরে চুনের পাত্রটা বসিয়ে দাও। নীচের পাত্রের জল যখন ফুটতে আরম্ভ করবে, তখন চুনের পাত্রে ৩।৪টি পাতা ফেলে দাও এবং কয়েক মিনিট ধরে ফোটাও। মাঝে মাঝে একটা কাঠি দিয়ে চুনের জল ঘেঁটে দেবে; কিন্তু সাবধান, কাঠি দিয়ে নাড়বার সময় পাতার গায়ে সেটা যেন না লাগে।

পাতাগুলো চুনের জলে বেশ কয়েক
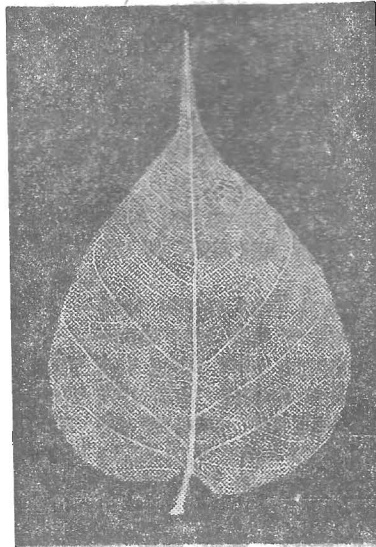
মিনিট ফোটবার পর একটা পাতা বোঁটা ধরে বের করে সমান কোনো জায়গায় রাখো এবং ফেলে-দেওয়া একটা নরম কুঁচির দাঁত-মাজা বুরুশ নিয়ে হালকা চাপ দিয়ে ঘষে ঘষে পাতার সবুজ অংশ উঠিয়ে ফেলো। এই সবুজ অংশ খুব সহজেই উঠে যায়, তাই নরম কুঁচির বুরুশ নিতে বলেছি। শক্ত কুঁচির বুরুশে সবুজ অংশ অবশ্যই উঠে যাবে, কিন্তু তাতে পাতার শিরা-উপশিরাও নষ্ট হতে পারে।

যদি একবারের চেষ্টায় সবুজ অংশ না ওঠে, তবে পাতাটা চুনের জলে ফেলে আরও কিছুক্ষণ ফোটাবে। মোট কতোটা সময় পাতাগুলো চুনের জলে ফোটাতে হবে, তার বাঁধা-ধরা কোনো নিয়ম নেই। কেননা সেটা নির্ভর করবে পাতার স্থূলত্ব (অর্থাৎ পাতা মোটা না পাতলা), চুনের তেজ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের ওপর। অভিজ্ঞতাই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবে।

এবার কাজের কথায় আসা যাক। এক পিঠের সবুজ অংশ উঠিয়ে ফেলার পর বোঁটা ধরে পাতাটা উল্টে দাও এবং বুরুশ দিয়ে আগের মতো এ পিঠের সবুজ অংশও উঠিয়ে ফেলো। এইভাবে দু' পিঠেরই সবুজ অংশ সম্পূর্ণভাবে উঠে গেলে পাতাটা ঠাণ্ডা জল ভরা একটা পাত্রে ফেলে পাত্রটাই নেড়ে নেড়ে (পাতা ধরে নেড়ে নয়) ধুয়ে ফেলো। চুন যাতে না থাকে, তার জন্য পাত্রের জল বদলে বদলে পাতাটা ৩।৪ বার ধোবে। তারপর পাতাটার বোঁটা ধরে জল থেকে তুলে একখণ্ড কাগজের ওপর (ব্লটিং পেপার হলেই ভালো হয়) সমান করে বিছিয়ে শুকোতে দাও। রোদে শুকোলেই ভালো হয়, কারণ সূর্যের এমন একটা গুণ আছে, যাতে পাতার শিরা-উপশিরাগুলো সাদা হয়ে যায়। তবে সাবধান, শুকোবার সময় পাতার কঙ্কাল যেন হাওয়ায় উড়ে না যায়।

এবারে কার্ড বোর্ডের ওপর আঠা দিয়ে কালো কাগজ মেরে সেই কালো কাগজের ওপর পাতার কঙ্কাল সেঁটে দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও। যদি কঙ্কালের সংখ্যা বেশী হয়, তবে কালো বোর্ডের ফটো-অ্যালবামে কঙ্কাল-গুলো আটকে রাখাই ভালো।

খুকু

চিত্তরঞ্জন দেব

সবাই বলে খুকু—এমন কেন!
কারুর মত নয় সে মেয়ে—
একটু কেমন যেন
কানা খোঁড়া দেখলে খুকুর চোখে ঝরে জল
দুঃখ তাদের ঘুচবে কিসে তাই নিয়ে চঞ্চল।
দীনভিখারি যখনি কেউ
আসে তাদের দোরে
খেতে দিয়ে পরতে দিয়ে কতই আদর করে।
চলে গেলে একলা বসে তাদের কথা ভাবে
এমনিভাবে কি গো ওদের
সারা জীবন যাবে।
পথের মাঝে দুজন লোকে ঝগড়া যদি করে
ছুটে গিয়ে খুকু তাদের মাঝখানেতে পড়ে।
খুকুর জন্য ভেবে ভেবে মা-বাবা হয়রান
সবার জন্যে ভেবে ভেবেই
খুকুব যাবে প্রাণ।
চাল রাখে না ডাল রাখে না,
বিলোয় কাপড় জামা
সংসার নয়, দানসত্র—বলেন খুকুর মামা।
শুধু কি তাই—ফাঁদ পেতে কেউ
যদি ইঁদুর ধরে
খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে খুকু যে যায় মরে।
বেওয়ারিশ কুকুরছানা বিড়ালছানা যত
কুড়িয়ে এনে খুকু তাদের সেবাতে হয় রত।
হেঁটমুণ্ড মুরগী নিয়ে ফেরিওয়ালা গেলে
পথ আটকে দাঁড়ায় খুকু সকল কর্ম ফেলে।
তাকে দেখে মুরগীগুলো চেঁচায় তারস্বরে
পাড়াপড়শী ছুটে বেরয় কেউ থাকে না ঘরে।
মা হারিয়ে ছাগলছানা দূরে কোথায় ডাকে
সারাটা দিন খুকু যেন কানটি পেতে রাখে।
খুকু যেন খুকুটি নয়—আরেক ভগবান
সবার জন্য ভেবে ভেবে নিত্য সে হয়রান।

(ফুলদল খেলে হোলী—শেষাংশ)

সবার প্রস্থান; বসন্তরাণী বাসন্তিকাকে কেন্দ্র করে সকল রঙের ফুল নাচতে লাগল]

[সমবেত নৃত্য-গীত]

আজকে সবার হোলী খেলা ফুলের
উপবনে—
সবাই আজি গাঁথছে মালা নৃত্য-
গীতের সনে—
রঙের খেলা ফুলের মেলা—
কাটছে সবার সকল বেলা—
সফল রঙের মাল্যখানি গাঁথছে
মনে মনে।

বনে-বনে ফুটল কুসুম তাইত'
রঙের হোলী—
মাটির সবুজ মেঘের আভায় তাই ত'
গলাগলি।
রঙ-কুসুমে মশাল জ্বালি
নৃত্যে-গীতে লাগাও তালি—
গান ধরেছে কালো কোকিল
দোলন-চাঁপার বনে॥

[রঙের খেলায়, সুরের মেলায় কাননে কান্তারে ফুলদলের হোলী খেলা সার্থক হল]

য-ব-নি-কা

ভক্তের বোঝা ভগবানে বয়

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অনেকদিন আগেকার কথা। সিপাহী বিদ্রোহেরও ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের ঘটনা এটা।

মধ্যভারতে—নাসিকের উত্তরে ওঙ্কারেশ্বর শিবের মন্দির। ওঙ্কারনাথও বলেন কেউ কেউ। বিখ্যাত মন্দির। সারা ভারতে যে কটি জ্যোতির্লিঙ্গ শিব আছেন, ওঙ্কারনাথ তারই একটি। লোকের ধারণা—এ-সব জায়গায় শিব নিজেই প্রকাশ পেয়েছেন, কোন মানুষের প্রতিষ্ঠা করা নয়।

যখনকার কথা বলছি—ওঙ্কারেশ্বরে এক গরিব ব্রাহ্মণ থাকতেন, ভারী ভক্ত—পুজোপাঠ ব্রত-উপবাসেই দিন কেটে যেত, টাকাকড়ি রোজগার করার বিশেষ অবসর পেতেন না। জমিজমাও এমন কিছু ছিল না, কোনমতে সংসার চালাতেও কষ্ট হত। তাই বলে কারও কাছে ভিক্ষা করতেন না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ভক্ত মানুষ উপবাসে থাকবেন মনে করে নিজে থেকেই কেউ কেউ ভিক্ষা পাঠাতেন হয়ত, কিংবা কিছু প্রণামী দিয়ে যেতেন, তাতেই যা হয় করে চলে যেত।

কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলেমেয়ে ছিল। তারা বড় হচ্ছে। বিশেষ বড় মেয়েটির বিয়ে আর না দিলেই নয়। খোঁজখবর করতে একটি পাত্রও জুটল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে তো আর শুধু হাতে হয় না, টাকার দরকার। বেশ কিছু টাকা চাই। এত টাকা পাবে কোথা?

স্ত্রী নিত্যই তাগাদা করেন, 'দুচারজনের কাছে গিয়ে দায় জানাও, প্রার্থনা করো—টাকা কি আর আসমান থেকে পড়ে?... লোককে না জানালে কে তোমার ঘরের খবর নিয়ে যেচে টাকা পৌঁছে দিয়ে যাবে শুনি?'

ব্রাহ্মণ বলেন, 'এতদিন তো কখনও কারও কাছে হাত পাতিনি, আজ কার কাছে যাব বলো? ও আমি পারব না। ওঙ্কারেশ্বরের চরণে পড়ে আছি—যদি চাইতে হয় তো তাঁর কাছেই চাইব।'

'আরে, তিনি তো দেবেন ঠিকই—তবে তিনি কিছু আর সত্যিসত্যিই হাত বার করে দেবেন না, কোন মানুষের হাত দিয়েই দেওয়াবেন।' স্ত্রী বোঝাতে চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্মণ বলল, 'সে তাঁর যা খুশি তাই করবেন। আমি তাঁকে জানিয়েই খালাস।'

যে কথা সেই কাজ। ব্রাহ্মণ সেদিন থেকে নিত্য মন্দিরে একমনে শিবকে জানান তাঁর অভাব। খানিকটা এক মনে ডেকে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আসেন, হাসি হাসি মুখে ব্রাহ্মণীকে বলেন, 'আসল রাজ-দরবারে তোর আর্জি পৌঁছে দিয়েছি বামণী, আর ভয় নেই। দ্যাখ্ না, এবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।'

এদিকে হয়েছে কি, বংশীধর বলে একটি তরুণ ছেলে নাসিক থেকে আসছিল ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করতে। তখন হাঁটাপথই ভরসা ছিল, পথে চোর-ডাকাতের ভয়ও ছিল খুব বেশী। অবশ্য বংশীধরের সে সব ভয় ছিল না ওর কাছে টাকাকড়ি কিছুই যখন নেই, তখন আর ঠগী ডাকাতের ভয়টা কি? বংশীধর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, ইচ্ছেটা ভাল গুরু পেলে সন্ন্যাস নেবে। তার এ-সব দিকে অত চিন্তাও ছিল না।

কিন্তু বংশীধরের চেহারাটা এমন, দেখলেই বড়লোকের ছেলে বলে মনে হত। পথে একদল ডাকাতও সেই ভুল করে তার সঙ্গ নিল। দৌলতাবাদের কাছে এক চটিতে এসে তারা বংশীধরের খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল। সাংঘাতিক বিষ, খাওয়ার পরই সাপের কামড়ের মতো সমস্ত দেহ নীল হয়ে গেল, মুখ দিয়ে গাঁজলা ভাঙতে লাগল। সঙ্গী যারা ছিল তারা বেগতিক দেখে সরে পড়ল। ডাকাতরাও যখন কাপড়-জামা ঝুলি ঘেঁটে বিশেষ কিছু পেল না, 'দুত্তোর' বলে সেইখানেই ওকে ফেলে চলে গেল।

তবে রাখে কৃষ্ণ মারে কে! সেই পথ দিয়ে এক ধনী জমিদার যাচ্ছিলেন। তিনি ছেলেটাকে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে বৈদ্য ডেকে ওষুধ খাইয়ে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর একটু সুস্থ হ'তে সঙ্গে করে দৌলতাবাদে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

সে ভদ্রলোকদের বংশীধরের ওপর খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, সে তাঁদের কাছেই থেকে যাক। কিন্তু বংশীধর সন্ন্যাসী হবার জন্যে বেরিয়েছে, আবার সংসারে জড়াতে তার ইচ্ছা হল না। সে আবার তীর্থযাত্রার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এঁরা যখন দেখলেন কিছুতেই ওকে ধরে রাখা যাবে না, তখন বললেন যে, 'সঙ্গে তাহলে টাকাকড়ি লোকজন নিয়ে যাও।' বংশীধর তো অবাক, যে সব ত্যাগ করে যেতে চাইছে, সে বড়লোকের মতো লোক-লস্কর ধনদৌলত নিয়ে যাবে কি!

শেষ পর্যন্ত অনেক পীড়াপীড়িতে, সামনে দারুণ শীতের দোহাই দিতে একটা পুরনো কাঁথা মাত্র নিতে রাজী হলো। ওঁরা করলেন কি, সেই কাঁথার পাড়ের খাঁজে খাঁজে পঞ্চাশটা মোহর পুরে সেলাই করে দিলেন।

কাঁথাটা পাট করে ঝুলির মধ্যে পোরা ছিল, অত টের পায়নি বংশীধর, কিন্তু রাত্রে গায়ে দেবার দরকার হতে বার করে দেখল, পাড়ের দিকটা অস্বাভাবিক ভারী। অবাক হয়ে একটা কোণ একটু খুলে দেখে ঐ কাণ্ড!

এঁদের ভালবাসার কথা ভেবে খুবই ভাল লাগল। কিন্তু এ টাকা নিয়ে সে কি করবে? স্থির করল ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করে তাঁকেই প্রার্থনা জানাবে—একটি সৎ অথচ গরিব লোক দেখিয়ে দিতে—যাকে ঐ ভালবাসার দান টাকাটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

ওঙ্কারেশ্বরে পৌঁছে পুজো করে মন্দির থেকে বেরোতেই নজরে পড়ল—নাট-মন্দিরের এক পাশে বসে একটি ব্রাহ্মণ এক মনে শিবের স্তব পাঠ করে যাচ্ছেন। দুই চোখে তাঁর জল। লোকটির কাপড়-জামা দেখলে গরিব বলেই মনে হয়—কিন্তু ভারী প্রশান্ত চেহারা, ভক্ত লোক যে তাতেও সন্দেহ নেই।

একটু অপেক্ষা করে ব্রাহ্মণের স্তব পাঠ শেষ হতে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বংশী বলল, 'ভগবান ওঙ্কারেশ্বর আপনার জন্যে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন। এই নিন সে টাকা।'

ব্রাহ্মণ কিন্তু একটুও অবাক হলেন না। শুধু বললেন, 'পুরোটাই আছে তো? আমার মেয়ের বিয়েতে—হিসেব করে দেখেছি, প্রায় পঞ্চাশ মোহরের মতো লাগবে।'

বংশীধর বলল, 'হ্যাঁ, পুরোটাই আছে।'

ব্রাহ্মণ খুশী হয়ে টাকাটা নিয়ে বাড়ি রওনা দিলেন। তিনি তো জানতেনই যে, তাঁর দরকার বুঝলে ওঙ্কারেশ্বর ঠিক থাকতে পারবেন না, যা হয় একটা ব্যবস্থা করেই দেবেন। বামুণীই বিশ্বাস করতে চায় না।

বংশীধর ব্রাহ্মণের ঐ বিশ্বাস আর ভক্তির কথা কোন দিন ভোলেননি। উত্তর-কালে তিনি যখন খুব বড় সন্ন্যাসী হয়েছিলেন—অনেক ভক্ত আর অনেক শিষ্য হয়েছিল তাঁর—তখনও বহুবার ঐ ব্রাহ্মণের কথা গল্প করেছেন।

এই বংশীধর কে জানো? বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। একাধারে বড় সন্ন্যাসী আর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।

ভগবান ওঙ্কারেশ্বর আপনার জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছে,—এই নিন সেই টাকা

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য

আদিত্য ওহদেদার

ভারতের এই অঞ্চলটা খুবই পাহাড়ি। যেমন রয়েছে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি, তেমনি আছে জঙ্গল এবং খরস্রোতা নদী ও ঝর্ণা। এখানে যারা বাস করে তারা অনেক উপজাতিতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে নিত্যি লেগে আছে লড়াই। এক এক সময় লড়াই এত জোর লাগে যে, সৈন্য পাঠিয়ে তা থামাতে হয়

এই রকম এক লড়াই থামাবার ভার পড়েছিল তরুণ বাঙালি ক্যাপটেন অরুণ ঘোষের ওপর। তার যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি। অরুণ দুদিনেই লড়াই থামিয়ে তার শিবিরে ফিরে এল।

কিন্তু এসেই তার ওপরওয়ালা কর্ণেল হুকুম সিং-এর কাছে শুনল—পরদিনই তাকে যেতে হবে ঐ অঞ্চলে।

কেন?

কর্ণেল হুকুম সিং বললেন, তোমাকে একটি জিনিস সেখান থেকে লুকিয়ে নিয়ে আসতে হবে। জিনিসটি আর কিছুই নয়—একটি এক হাত পরিমাণ লাঠি।

শুধু একটা লাঠি আনতে যেতে হবে অত দূরে! অরুণ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল

কর্ণেল বললেন, বুঝতে পারছি ক্যাপটেন ঘোষ, তুমি আশ্চর্য হচ্ছ। ব্যাপার কি জানো, ঐ লাঠিটা যদি আনতে পারো তাহলে ঐ অঞ্চলে আর লড়াই বাধবে না ওখানকার উপজাতিদের মধ্যে। কারণ, লড়াইয়ের কারণ হল ঐ লাঠি। লাঠিটা ওদের কাছে একটি বিগ্রহ—দেবতার আশীর্বাদ আছে ওর ওপর। ওদের বিশ্বাস, লাঠিটা যে দলের সর্দারের আয়ত্তে থাকবে সে দলের ওপর ভাগ্যদেবী প্রসন্ন থাকবেন। সে দলের কোনো ক্ষতি অন্য দল করতে পারবে না। প্রত্যেক সর্দার চায় এই লাঠি নিজের কাছে রাখতে, আর সেইজন্যেই ওদের মধ্যে এত লড়াই।

কিন্তু স্যর, এই লাঠির খোঁজ আমি কেমন করে পাবো? প্রশ্ন করল অরুণ।

কর্ণেল অরুণের সামনে একটা মানচিত্র খুলে ধরলেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, যে জায়গা থেকে লড়াই করে এসেছে অরুণ; তারই মাইল দুই উত্তর দিকে আছে একটা ছোট পাহাড়। কিন্তু ঘন জঙ্গলে ভরা। এই পাহাড়ের এক জায়গায় আছে একটা ভাঙা মন্দির, যার মধ্যে আছে সেই লাঠি।

কর্ণেল বললেন, তোমার সঙ্গে দুজন সেপাই যাবে। ওরা ঐ অঞ্চলের লোক। পথ চেনাবার কাজে তোমায় সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা যেন না জানতে পারে—তুমি কী জন্যে ওখানে যাচ্ছ।

দুদিন পরে পৌঁছল সেই পাহাড়ের কাছে। তখন সন্ধে উতরে বেশ খানিক রাত হয়েছে। অমাবস্যার রাত। তার ওপর চারিদিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল। আলকাতরার মতো অন্ধকার।

এই অন্ধকারেই কাজ সারতে হবে। ফিরে এসে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিলে চলবে। সিপাই দুটো টর্চের আলো ফেলে ফেলে পাহাড়ে ওঠবার পথ খুঁজতে লাগল।

পথ পাওয়া গেল। একই জায়গা থেকে দুটো সরু পথ দু-দিকে চলে গেছে।

অরুণ সিপাইদের একজনকে বলল, তুমি ওই পথ ধরে যাও, আমরা এই পথ ধরি। পথে কাউকে যদি দেখতে পাও তাকে আটকাবে—না শুনলে তাকে গুলিও করতে পারো। হাঁটতে হাঁটতে পথের ধারে হয়ত একটা মন্দির দেখবে। যদি তা দেখ তাহলে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না আমরা সেখানে পৌঁছোই।

যে পথ অরুণ ধরল সে পথে প্রায় ঘণ্টা দুই হাঁটবার পর মন্দির পাওয়া গেল। অরুণ দেখল, তাদের আগেই অন্য সিপাই পৌঁছে গেছে। সে চুপ করে পাহারা দেবার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সিপাই দুজনকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে

টর্চের আলো ফেলে দেখল...

বলে অরুণ মন্দিরের মধ্যে ঢুকল। টর্চের আলো ফেলে দেখল মন্দিরের মাঝখানে একটা ছোট্ট বেদী। কিন্তু কই, কোনো লাঠি তো নেই। কিছু ভাঙা ইঁট-পাথর ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে—আর কিছুই মন্দিরের ভেতর নেই। টর্চের আলোয় মন্দিরটার চারিদিক খুব ভালো করে পরখ করে নিল অরুণ।

না, কোনোরকম লাঠি কোথাও নেই।

জিনিসটা না পেয়ে অরুণ বিষণ্ণ মনে পাহাড়ের নীচে নেমে এল। সিপাইদের তাঁবু খাটাতে বলল।

একে পৌষ মাস তার ওপরে পাহাড়ি অঞ্চল। হাড়-কাঁপানো শীত। তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে আগুন জ্বালানো হল।

অরুণ নিজের তাঁবুতে বসে চুপ করে ভাবতে লাগল, যার জন্যে আসা তা সফল হচ্ছে না। শুতেও ইচ্ছে করল না। কতক্ষণ এইভাবে ছিল মনে নেই, হঠাৎ বাইরে একটা আওয়াজ শুনতে পেল অরুণ। কান খাড়া করে শুনল—কারা যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

পিস্তল উঁচিয়ে টর্চ ফেলে এক লাফে বাইরে এল। দেখল, সিপাই দুজনই একটা কী নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

একী হচ্ছে? তোমরা নিজের লড়ছ—জোরে ধমক দিল অরুণ।

সিপাই দুটো থমকে দাঁড়াল!

অরুণ হুকুম করল, এদিকে এস। ওরা কাছে আসতেই অরুণ দেখল, ওদের একজনের হাতে শক্ত করে ধরা আছে একটা কালো এক হাত পরিমাণ লাঠি। একদিক মোটা, একদিক সরু। মোটা দিকটা একটা রুপোর পাত দিয়ে মোড়া।

অরুণের মন আনন্দে দুলে উঠল—যে জিনিসের জন্যে আসা সে জিনিস তো চোখের সামনেই দেখছে অরুণ। কিন্তু মনের আনন্দ চেপে রেখে খুব গম্ভীর হয়ে লাঠির দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ জিনিসটা আমার হাতে দাও।

সিপাই লাঠিটা অরুণের হাতে দিল। জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখে অরুণ ওদের বলল, কী ব্যাপার, তোমরা লড়ছিলে কেন?

একজন সিপাই বলল, স্যর, ওটা আমার জিনিস। কিন্তু ও ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে।

অন্যজন বলে উঠল, ওটা ওর নিজের জিনিস নয়, স্যর। ওটা ও চুরি করেছে। আপনি তো জানেন, ও আমাদের আগে মন্দিরে পৌঁছেছিল। জিনিসটা মন্দিরের মধ্যে ছিল, ও তখনি জিনিসটা নিয়ে বাইরে একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। তাঁবুর মধ্যে আমরা দুজন যখন শুয়েছিলাম তখন আমি ঘুমিয়ে আছি ভেবে ও চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে জিনিসটা আনতে।

প্রথমজন এবার বলল, আমি যখন আগে পেয়েছি তখন ওতে আমারই অধিকার।

বকের কাশি

কালিদাস ভট্টাচার্য

এক বুড়ো বক
কাশে খক খক,
শালিকটা এসে কয়
"কাশি কেন মহাশয়
হল ভয়ানক?"
বক বলে "কাল ছিল
ময়নার বিয়ে
সেজেগুজে বাবু হ'য়ে
বিয়ে বাড়ি গিয়ে
খেয়েছি যে শখ করে
ঝাঁ চকচকে করে
তিন বাটি টক
তাই গেছে গলা ব'সে
কাশি খক খক॥"

আহা-রে! বেরুবে কি করে! ফটো ঃ রেখা সেন

শক্তি পরীক্ষা হোক, তবে তো বুঝব কার অধিকার।

অরুণ তাদের ধমক দিল। ওরা সেলাম ঠুকে শান্ত হয়ে দাঁড়াল।

লাঠিটা নিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে অরুণ ওদের বললে, এক মিনিট পরে আমার সংগে তোমরা দুজনেই দেখা করবে।

ভেতরে এসেই অরুণ লাঠিটা তার বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখল। কিছু জ্বালানি কাঠ ভেঙে সামনের আগুনে দিল—আগুন আরো জ্বলে উঠল। অরুণ বিছানার ওপর বসে রইল।

এক মিনিট পরে সিপাই দুজন ভিতরে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। অরুণ রাগত স্বরে বলল, দেখ তোমাদের মধ্যে যা নিয়ে লড়াই তা আমি ওই আগুনে ফেলে দিয়েছি। ছিঃ, একটা লাঠি নিয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে দিয়েছিলে! তোমরা না সৈনিক। তোমাদের কোনো কথা শুনতে চাই না। যাও, তাঁবুর মধ্যে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়।

লাঠিটা আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছি—অরুণের এই কথা শুনে সিপাই দুটো আগুনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। কী যেন বলতে গেল, কিন্তু ক্যাপ্টেনের হুকুম তামিল করে সেলাম ঠুকে তাঁবুর বাইরে চলে গেল।

পরদিন তখনো ভোরের আলো তেমন ফুটে ওঠেনি। কাছেই কোথা থেকে শব্দ এল—গুড়ুম্, গুড়ুম্। সিপাই দুজন তাদের তাঁবু থেকে বাইরে এল। আবার সেই শব্দ। স্পষ্ট বন্দুকের আওয়াজ-সামনের জঙ্গল থেকে। কী ব্যাপার? ওরা অরুণের তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। কই, ক্যাপ্টেন তো নেই! তাহ'লে?

ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল যেদিক বন্দুকের আওয়াজ শুনেছিল। জঙ্গলের মধ্যে একটু ঢুকতেই দেখতে পেল ক্যাপ্টেন মাটিতে বসে আছেন, তাঁর এক পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে বন্দুক।

এ কী সার, আপনি এভাবে? সিপাই-দের কণ্ঠে উদ্বিগ্ন স্বর।

অরুণ বলল, আমাকে তুলে ধরো। তোমাদের কাঁধে ভর দিয়ে যেতে হবে। একটা শব্দ শুনে এসেছিলাম। তোমাদের আর ডাকিনি। লাফাতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছি। পা'টা বেশ জোরে মচকেছে।

হাঁটু পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

তাঁবু গুটিয়ে সিপাইরা একটা স্ট্রেচার তৈরি করল। তার ওপর শুয়ে অরুণ এল নীচে তার সৈন্যাবাসে।

কর্ণেল হুকুম সিং-এর ঘরে স্ট্রেচারে শায়িত অরুণকে রেখে সিপাইরা চলে গেল।

কর্ণেল বললেন, তুমি এমন আহত হলে কী করে, ক্যাপ্টেন ঘোষ?

অরুণ তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল। সেলাম ঠুকে বলল, আমাকে কি আহত বলে মনে হচ্ছে, সার?

কর্ণেল বুঝলেন, অরুণের আঘাতটা ভান। তিনি কৌতূহলী হয়ে বললেন, ব্যাপার কী, খুলে বল।

অরুণ সব খুলে বললে। লাঠিটা বিছানার নীচে তখনকার মতো লুকিয়েছিল বটে। কিন্তু পরদিন ওটা কোথায় লুকোবে? বিছানাপত্র ও তাঁবু গোটাবার কাজ তো ওই সিপাইদের। অরুণ বিছানা গোটালে ওদের সন্দেহই হবে। অথচ অন্য কোথাও সরাবার উপায় নেই। তাই অন্ধকার থাকতে চুপিচুপি সামনের জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হল এবং ঐভাবে পড়ে যাবার ভান করতে হল। মোটা ব্যাণ্ডেজের ভেতর লাঠিটা ঢুকিয়ে রাখলাম অনায়াসে। ওরা কিছুই বুঝতে পারেনি।

ব্যাণ্ডেজটা এক ঝটকায় খুলে ফেলে লাঠিটা বার করল অরুণ। কর্ণেলের হাতে সেটা দিয়ে বলল, এই নিন সার, আপনি যা চেয়েছিলেন।

কর্ণেল হুকুম সিং অরুণের পিঠ চাপড়ে বললেন, সাবাস ক্যাপ্টেন। এই তো চাই। সাধে বলে, বুদ্ধি যার বল তার।

আফ্রিকা দেশের প্রথম হীরা / অমলেন্দু সেন

বেশী দিনের কথা নয়—আজ থেকে শ'খানেক বছর আগেও পৃথিবীতে হীরে পাওয়া যেত একমাত্র এই ভারতবর্ষেই, আর আরও বেশির ভাগ আসত দক্ষিণ ভারতের গোলকোন্ডা খনি থেকে। এখান থেকে সেই হীরে চলে যেত ইউরোপের দেশে দেশে। কিন্তু গোলকোন্ডার সেদিন আর নেই। এখন পৃথিবীতে হীরের দেশ বলতে আফ্রিকাকে বোঝায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কিম্বারলীর আশেপাশে যে-সব হীরের খনি, তারাই এখন গোলকোন্ডার স্থান দখল করেছে।

এর শুরু হয়েছিল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। তখন সেখানে শহর-টহর কিছু হয়নি—এক গ্রামে থাকত ড্যানিয়েল জেকব্‌স্ বলে একজন চাষী। একদিন তার ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে বাড়ির পাশের ছোট্ট নদীটির ধারে খেলা করতে গিয়ে কয়েকটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে এল। তার মধ্যে একটাকে দেখতে একটু যেন অন্যরকমের।

তাদের মা সেটা দেখেছিলেন। তারপর একদিন কথায়-কথায় সে-কথাটা এক প্রতিবেশীকে বললেন। তার নাম নাইকার্ক। নাইকার্কের কি মনে হল, সে সেটা দেখতে চাইল। কিন্তু, বাচ্চাদের কান্ড তো! তারা নুড়িগুলো কোথায় ফেলে দিয়েছে, তা তারা বলতে পারল না। কাজেই একটু খুঁজতে হল। সেগুলো আর যাবে কোথায়—উঠোনের এক কোণে আস্তাকুঁড়ে সেই পাথরখানাকে পাওয়া গেল। নাইকার্ক সে-খানা নিল। সে অবশ্য কিছু দাম দিতে চেয়েছিল. কিন্তু তা শুনে জেকব্‌স্ আর তার বউ তো হেসেই মরে! নাইকার্কের যত সব ছেলেমানুষী!

এই নিয়ে গ্রামের অন্য সবাই তাকে ঠাট্টা করতে থাকায় নাইকার্ক পাথরখানাকে নিয়ে চলে গেল হোপটাউন শহরে। সে আর তার এক বন্ধু ওরাইলী, সেখানে পাথরখানাকে যাচাই করতে লাগল। কিন্তু শহরেও কেউ তাদের আমল দিল না। এমনকি, যখন দেখা গেল যে, পাথরখানা দিয়ে কাঁচের ওপর দাগ কাটা যায়, তখনও লোকের বিশ্বাস হল না। হীরে কখনও এদেশে পাওয়া যায়? যত সব বাজে কথা! তারা জানত না যে, কাঁচ শুধু হীরে দিয়ে কাটা যায়।

শেষে একজনকে ধরে-পড়ে পাথরখানাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল লন্ডনে। তুচ্ছ নুড়ি মনে করে ওটাকে এমনি ডাকে পাঠানো হল।

এতদিনের চেষ্টার ফল এবার ফললো। পরীক্ষায় জানা গেল যে, পাথরখানা সত্যিই হীরে। তার দাম প্রায় সাড়ে তেরো হাজার টাকা। চুক্তিমত নাইকার্ক আর ওরাইলী তার অর্ধেক-অর্ধেক ভাগ পেল।

তখন লোকের বিশ্বাস হল যে, নাইকার্ক নিছক পাগল নয়। কিন্তু তাই বলে কি মেনে নিতে হবে যে, আফ্রিকায় হীরের খনি থাকতে পারে? এই ভেবে বুদ্ধিমান লোকেরা চুপ করে রইল।

কিন্তু 'বোকা' নাইকার্ক চুপ করে থাকেনি। সেই নদীর ধারে ধারে সে খোঁজ করতেই লাগল। তারপর দুই বছরের চেষ্টায় সে খবর পেল যে, দূরে এক গাঁয়ে একটি রাখাল ছেলের কাছে একখানা নতুন ধরনের পাথর আছে।

এবার আর বিনি পয়সায় হল না—রাখাল ছেলেটিকে পাঁচশো ভেড়া, দশটি বলদ, আর একটি ঘোড়া কিনে দিয়ে নাইকার্ক তার বদলে এই হীরেখানা পেল।

এই হীরেখানা ছিল আগেরটার চাইতে চারগুণ বড়। হোপটাউনে নিয়ে গিয়ে নাইকার্ক সেটাকে বিক্রি করে দিল পৌনে দু' লাখ টাকায়। তার আসল দাম ছিল আরও ঢের বেশি। এই হীরেখানাই পরে 'স্টার অব সাউথ আফ্রিকা' নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে।

এইবার লোকের টনক নড়ল। দেশবিদেশ থেকে শত শত লোক ছুটে এল হীরের খোঁজে দক্ষিণ আফ্রিকায়। গড়ে উঠল হীরার শহর কিম্বারলী।

ভারতেও এইভাবে হীরে পেয়ে যাবার খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এই তো কদিন আগে মধ্যপ্রদেশের পান্না শহরের পীর খাঁ দরজী মাটি খুঁড়ে একটি হীরে পেয়েছে, তার দাম হবে দু' লক্ষ টাকা। এর আগে পান্নারই আর একজন লোক—তার নাম রসুল—চার লাখ টাকা দামের একখানা হীরে পেয়েছিল এই এলাকাতেই।

কিম্বারলী গিয়ে আর লাভ নেই, কিন্তু একবার পান্নায় গেলে কেমন হয়?

কাজল দীঘির কাজলা দিদি — বিভূতিভূষণ আদক

কাজলের মত কালো জল। সেই কালো জলের এপার-ওপার দীঘি। তাতে শালুক ফোটে, পদ্ম ফোটে। ফোটে কত রকমের নাম-না-জানা ফুল। কত রং বেরঙের। সেই ফুলে ভোমরারা গান গায়—গুন্-গুন্ গুন্-গুন্। চলচিত্তির পাখনা মেলে প্রজাপতি নাচে—তির্ তির্ তির্ তির্। ডুব্ ডুব্ সাঁতার কাটে হাঁস পানকৌড়ি। পাড়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে বক। কিচির-মিচির পাখ-পাখালী।

সবাই বলে—কাজল দীঘি।

দীঘির পাড়ে খড়ে ছাওয়া ছোট্ট কুঁড়ে

কাজল দীঘির পাড়ে খড়ে-ছাওয়া ছোট্ট একটি কুঁড়ে। কুঁড়েতে বাস করে কাজল-কালো এক মেয়ে। তার কাজলের মত চুল, কাজলের মত চোখ, কাজলের মত দেহের বরণ; সবাই বলে—কাজলা দিদি।

কাজলা দিদি দুঃখী বিধবা। এ বনে ও-বনে কাঠ কুড়োয়। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ভিক্ষে মাগে। কোনরকমে পেট চালায়। সে নিঃসন্তান।

তবে কি কাজলা দিদির কেউই নেই? আছে। আছে ঐ গ্রামেরই ছোট্ট সোনা ছেলে-মেয়ের দল। তারাই তার বন্ধু। খেলার সাথী, আপনজন। ছেলেমেয়ে—সব।

ছোট্ট সোনারা কাজলা দিদিকে খুব ভালোবাসে। ঠিক দিদির মতন। খুব শ্রদ্ধা করে। ঠিক মায়ের মতন। তারা কাজলা দিদিকে পৌষ-পাব্বনের পিঠে এনে খাওয়ায়। বিজয়ার দিনে প্রণাম করে পায়ের কাছে রেখে দেয় নারকোলের নাড়ু। কাজলা দিদিও বনের কোথাও কোন নতুন ফল পেলে তা নিয়ে আসে। ভাগ করে দেয় সবাইকে। কাজলা দিদিকে ভালোবাসে ছোট্ট সোনাদের মা-বাবারাও। তারাও কাজলা দিদিকে পালে-পাব্বনে নেমন্তন্ন করে ঘরে এনে পাঁচ তরকারী ভাত খাওয়ায়। কাজল দীঘির পাড়ের কাজল-বরণ দুঃখী মেয়ে সবার কাছেই কাজলা দিদি। কাজল দীঘির কাজলা দিদি।

সন্ধ্যেবেলায় বাঁশবাগানের মাথার ওপরে চাঁদ উঠলে, বনে-বাদাড়ে শেয়াল ডাকলে ঝোপে ঝোপে জোনাকী জ্বললে, কাজলা দিদি ঘর-কন্নার কাজ সেরে দাওয়ায় এসে বসে। স্কুলের নতুন দিনের পড়া সেরে গ্রামের ছোট্ট সোনারাও ভিড় করে বসে দাওয়ায়। তারা গল্প শুনবে কাজলা দিদির মুখে। কাজলা দিদি তাদের গল্প শোনায়। কত রকমের গল্প। ছড়া কাটে। শোলোক বলে। ছোট্ট সোনারা অবাক হয়ে শোনে। কি মিষ্টি গলা কাজলা দিদির। কি মিষ্টি গল্প! গল্প শেষে কাজলা দিদি ছোট্ট সোনাদের পৌঁছে দিয়ে আসে। তাদের আপন আপন ঘরে।

সোনার দলের ছোট্ট এক মেয়ে। নাম তার রিংকুসোনা। যেমন চটপটে তেমনি চালাক। এটা ওটা কতো তার জিজ্ঞাসা। কাজলা দিদি, ওটা কেন অমন হলো? কাজলা দিদি, ওটা কেমন অমন হলো? এমনি আরও কত কি। কাজলা দিদি হেসে সব প্রশ্নের জবাব দেয়। বলে—"তোর মাথায় খুব বুদ্ধি। বড় হলে তুই মস্তবড় পন্ডিত হবি।" আদর করে কাছে টানে। বুকে চেপে ধরে। মাথায় চুমু খায়। কাজলা দিদি রিংকুকে খুব ভালোবাসে।

একদিন সন্ধ্যায় গল্পের আসরে সবাই এল। এল না রিংকুসোনা। কাজলা দিদি

খবর নিয়ে জানল—তার অসুখ করেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল কাজলা দিদির। গল্পে মন লাগল না। আসরও জমল না। কাজলা দিদি সব্বাইকে যে যার ঘরে পৌঁছে দিয়ে ছুটে গেল রিংকুসোনাদের বাড়ি।

রিংকু তখন বিছানায়। চুপচাপ শুয়ে। জ্বরে গা' পুড়ে যাচ্ছে। কাজলা দিদি তার মাথার কাছে বসল। কপালে হাত রাখল। মাথায় রাখল, গায়ে রাখল। রিংকুসোনা খুব খুশী হয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কাজলা দিদির হাত। বলল—"কাজলা দিদি! তুমি এসেছ?"

ছলছল চোখে কাজলা দিদি বলল—"হ্যাঁ।"

"কাজলা দিদি, আমার বড্ড অসুখ, কিচ্ছু ভালো লাগে না। আমি বাঁচবো?" হঠাৎ কেমন ভয়ে ভয়ে রিংকু জড়িয়ে ধরল কাজলা দিদির হাত।

কাজলা দিদি রিংকুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—"কেন বাচবে না সোনা? নিশ্চয়ই বাঁচবে। অসুখ করলেই কি সব্বাই মরে যায়? ওষুধ খাও, চুপচাপ শুয়ে থাক। সব ভালো হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমার যে বড্ড ভয় করে।"

"ভয় করলেই ভগবানের নাম নেবে। মনে মনে বলবে—ঠাকুর, আমার ভালো করে দাও। আমার মনে বল দাও; সাহস দাও।"

রিংকু বলে—"কাজলা দিদি! তোমার জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করে। তুমি গল্প বলো। সেই রাজপুত্তুরের গল্পটা।"

কাজলা দিদি গল্প শুরু করে। এক দেশে এক রাজা। তার ছিল দুই রাণী। সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। একদিন...গল্প চলে এগিয়ে। কাজলা দিদি রিংকুর মাথায় হাত বুলোয়। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে রিংকুসোনা। কাজলা দিদি তার সমস্ত শরীরটা চাদরে ঢেকে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে।

আলো ছায়ার আলপনা আঁকা আঁকা-বাঁকা পথ। দু'পাশে অন্ধকার ঝোপঝাড়। ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ রব। ঝিকমিক জোনাকী। মাথার ওপরে তারার মালাপরা কাজল কালো আকাশ। দূরে...কোথায় যেন নাম-না-জানা পাখির ডাক...টিট্টি...টিট্টি...। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে কাজলা দিদি। কাজল দীঘির পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে পড়ে যায় রিংকুর কথা। বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। ঝাপসা হয়ে আসে চোখ দুটো। অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কেঁদে কেঁদে বলে—"ওগো, আকাশ-মাটি-জল-জঙ্গলের দেবতা, আমার রিংকুসোনাকে ভালো করে দাও। ভালো করে দাও আমার ছোট্ট সোনাকে।" উপচে-পড়া চোখের জলে ভেসে যায় কাজলা দিদির কাজল কালো বুক।

এইভাবে এগিয়ে যায় দিন। এক, দুই, তিন। কাজলা দিদি রোজ যায় রিংকুদের বাড়ি। খবর নেয়। রিংকুসোনা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে।

সেদিন গভীর রাত। কাজলা দিদির দুচোখে ঘুম নেই। দাওয়ায় চুপচাপ বসে। চেয়ে আছে কাজল দীঘির দিকে। ভাবছে রিংকুর কথা। এমন সময় হঠাৎ চিৎকার ভেসে এল গাঁয়ের দিক থেকে। আগুন! আগুন! কাজলা দিদি চমকে মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকালো। দেখল, গাঁয়ের দিকের আকাশটা লাল। সিঁদুরের মত লাল টকটকে। সাপের মত জিভ মেলেছে আগুনের শিখা। কাজলা দিদি ঘর ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল গাঁয়ের দিকে।

এখানে ওখানে জটলা। কান্না। চিৎকার। ভয়-পাওয়া মানুষের ছুটোছুটি। বাতাসে পোড়াপোড়া গন্ধ। আগুনের ঝাঁজ। সবার মধ্যিখান দিয়ে কাজলা দিদি ছুটে চলল রিংকুদের বাড়ি। ছোট্ট সোনাদের খবর নিয়ে নিয়ে।

রিংকুদের বাড়িতেও আগুন। সেখানেও জটলা। চিৎকার, ছুটোছুটি, কান্না। রিংকুর বাবা-মা-কাকা সমস্ত আত্মীয় স্বজন রিংকুকে খুঁজছে। রিংকু বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু কি জানি কি কারণে

আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রিংকুকে পাঁজাকোলা করে

ঘরে ঢুকেছিল আবার। আর বেরুতে পারেনি। আটকা পড়ে গেছে। কাজলা দিদিকে দেখতে পেয়েই রিংকুর মা আরও জোরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল—"আমার রিংকুকে এনে দাও কাজলা দিদি।"

"রিংকুসোনা ঘরের ভেতরেই রয়ে গেছে? কি সর্বনাশ! রিংকু! রিংকু!" চিৎকার করে কেঁদে উঠল কাজলা দিদি। ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনে।

কিছুক্ষণ পরেই আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। রিংকুকে পাঁজাকোলা করে। তুলে দিল তার মায়ের কোলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল নিজে। মাটির বুকে। কাজলা দিদির কাপড়ে আগুন। আগুন মুখে, বুকে, মাথায়।

তারপর এক সময় সমস্ত আগুন নিভে গেল। শান্ত হলো সব কোলাহল। কিন্তু শান্ত হলো না কাজলা দিদি। যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। ডাক্তার এল। চিকিৎসা চলল। সঙ্গে সঙ্গে সেবা। কিন্তু কাজলা দিদির নিঃশ্বাস যেন ক্রমেই কমে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে। একটু একটু।

ছোট্ট সোনারা সবাই কাজলা দিদির কাছে। আশে-পাশে তাদের বাবা-মা ও গাঁয়ের সবাই। মাথার কাছটিতে রিংকু-সোনা। কাজলা দিদি আস্তে আস্তে হাতটা বাড়িয়ে দিল রিংকুর দিকে। রিংকু হাতটা জড়িয়ে ধরল। কাজলা দিদির চোখের কোণে জল। জল ছোট্ট সোনাদের চোখে। জল তাদের বাবা-মাদেরও চোখে। কাজলা দিদি কাঁপাকাঁপা গলায় বলল—"তুমি ভালো হয়ে গেছ রিংকু?" রিংকু মাথা নেড়ে বলল—"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি অমন করছ কেন কাজলা দিদি? আমার যে বড্ড ভয় করছে।" কাজলা দিদি বলল—"ভয় করতে নেই। ভালো করে পড়াশোনা কোরো। বড় হও, মানুষ হও।"...

আরও নিঃশ্বাস কমে এল কাজলা দিদির, আরও। ছোট্ট সোনাদের চোখ এখন কাজলা দিদির চোখে। কাজলা দিদির কাজল কালো চোখ বুজে আসছে। আস্তে আস্তে। একটু একটু। ছোট্ট সোনারা বলে উঠল—"কাজলা দিদি, তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না, কাজলা দিদি।" কাজলা দিদির মাথা নড়ল। ঠোঁট নড়ল। অস্ফুট আওয়াজ বেরুল—"না যাব না!" তারপর আরও একটা নিঃশ্বাস বেরুল। শেষ নিঃশ্বাস। সেই নিঃশ্বাসে কেঁপে উঠল ছোট্ট সোনাদের কচি কচি বুক। তারা সবাই কেঁদে উঠল—"কাজলা দিদি, কাজলা দিদি।" ছোট্ট সোনাদের সেই কান্নায় কেঁপে উঠল কাজল দীঘির কাজল কালো জল।...

কাজলা দিদির মরণের পর অনেকদিন কেটে গেছে। কিন্তু আজও ছোট্ট সোনারা ভুলতে পারেনি তাদের কাজলা দিদিকে। বাঁশবাগানের মাথার ওপরে চাঁদ উঠলেই, বনে-বাদাড়ে শেয়াল ডাকলেই, ঝোপে-ঝাড়ে জোনাক জ্বললেই মনে পড়ে যায় তাদের গল্প-বলা, ছড়াকাটা, শোলোক বলা সেই কাজলা দিদির কথা। তারা জানালার ধারে এসে বসে। চেয়ে থাকে কাজলকালো আকাশের দিকে। কাজলা দিদি বলেছিল—তোদের ছেড়ে যাব না। কিন্তু কোথায় কাজলা দিদি? কোথায়?

মায়েরাও ভুলতে পারেনি কাজলা দিদিকে। কাজলা দিদির কথা স্মরণ করেই তারা পেতলের পিদিমে ঘি পুড়িয়ে কাজললতার কাজল বানায়। পরিয়ে দেয় ছোট্ট সোনাদের চোখে।

তবে কি ছোট্ট সোনাদের ঐ চোখের কাজলেই রয়ে গেছে কাজলা দিদি? **কাজল দীঘির কাজলা দিদি?**

যদি সত্যি হ'ত!

সত্যব্রত বসু

[মঞ্চে একটি ছোট্ট ঘর, সাজানো গোছানো। মা বসে বই পড়ছেন। এমন সময় ছোট একটি ছেলে ঢুকল।]

ছেলে—মা, আমার ঘুম পেয়েছে। তুমি একটা গল্প বল—আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মা—আমি ত রোজ গল্প বলি, আজ তুমিই একটা গল্প বল, আমি শুনি।

ছেলে—তুমি শুনবে! বেশ আমি ঘুমবো না। বই রেখে দাও—আমি গল্প বলছি, মন দিয়ে শুনবে—ভয় পেও না যেন! ডাকাতের গল্প।

মা—তাই নাকি! আচ্ছা তুমি বল আমি ভয় পাবো না।

[আস্তে আস্তে স্টেজ অন্ধকার হয়ে গেল। পর্দায় দেখা যাবে ছোট বড় গাছপালা তার মধ্য দিয়ে রাস্তা। মাইকে ছোট ছেলেটির গলা]

"মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মা (তোমাকে)কে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে—।

(মায়ের স্বর)—তাই নাকি, তা বেশ হ'বে।

[পর্দায় দেখা যাবে অনেক দূর থেকে বেহারারা একটা পাল্কী কাঁধে করে আসা আর তার পাশে ঘোড়ায় চড়ে ছেলেটি]

ছেলে—তুমি যাচ্ছো পাল্কীতে মা, চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।

[পিছনে পর্দায় পাল্কীবেহারা ও ঘোড়ায় চড়া ছেলেটির ছবি বড় হয়ে উঠবে, তারপর তাদের ছুটে ঘরে চলে যেতে দেখা যাবে। বেহারাদের মুখে শব্দ হবে—

হুঁহুঁম্ না—হুঁহুঁম্ না
হুঁহুঁম্ না—হুঁহুঁম্ না।

[দেখা যাবে বউ-মেয়েরা জল আনতে যাচ্ছে, ছেলেরা বড়রা বাড়ি ফিরে আসছে। আস্তে আস্তে পর্দায় দৃশ্য মিলিয়ে যাবে। দেখা যাবে স্টেজে আবছা আলোয় কয়েকটি খড়ো-বাড়ি, কয়েকটা তাল গাছ। একটি ছেলে বসে বাদাম খাচ্ছে—একটি মেয়ে নাচতে নাচতে এল।]

মেয়েটি—এই দাদা আমাকে বাদাম দে।

ছেলেটি—দেবো, তুই আগে ঐ কবিতাটা বল—"

মেয়েটি—ইস্, আমি বলি, আর তুই সব বাদাম খেয়ে ফেল্। নাঃ আগে দে।

ছেলেটি—সব খাবো না, তোকেও দেবো। লক্ষ্মীবোন, বল না!

মেয়েটি—বেশ বলছি—[একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে—নেচে নেচে ভঙ্গী করে বলবে]

"তালগাছ এক পায় দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
কোথা পাবে পাখা সে?"

মেয়েটি—[তারপর দাদার কাছে এসে বলবে]—দে, এবার বাদাম দে!

[দাদা ওর হাতে বাদাম দিয়ে নিজে স্টেজে গিয়ে বাকিটা বলতে থাকবে]

ছেলেটি—"তাই তো সে
ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার

যেন কোথা যাবে ও।

[এতটা বলার পর, বাদামের ঠোঙাটা রেখে মেয়েটি ওর দাদার পাশে এসে বসবে]

মেয়েটি—তারপরে?

[দাদা হেসে বলবে, বোনও সঙ্গে যোগ দেবে]

ছেলে ও মেয়েটি—

তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়
পাতা কাঁপা থেমে যায়
ফেরে তার মনটি
যেইভাবে, মা যে-হয়-মাটি, তার
ভালো লাগে আর বার
পৃথিবীর কোণটি।

মেয়েটি—দাদা চল মার কাছে যাই সন্ধ্যে হয়ে এল।

ছেলেটি—চলরে বোন চল্।

[স্টেজ অন্ধকার। পর্দার ছায়ায় পাল্কী-বেহারারা পাল্কী কাঁধে করে আসছে। স্টেজে আলো। পর্দার ছায়া মিলিয়ে যায়।]

খোকন—[স্টেজে ঢুকে পাশের দিকে তাকিয়ে]—ঐখানে পাল্কী রাখো। তোমরা বিশ্রাম কর।

মা—[স্টেজে এসে]—"সন্ধ্যে হ'ল সূর্য নামে পাটে,

১ম বেহারা—[স্টেজে এসে]—এলেম যেন জোড়া দীঘির মাঠে।

এই চেয়ে দ্যাখ আমার তলোয়ার

২য় বেহারা—[প্রবেশ করে]—ধু ধু করে যেদিক পানে চাই,

৩য় বেহারা—[ভিতরে এসে]—কোনখানে জন মানব নাই—!

মা—[ভয় পেয়ে]—এলেম কোথা?

খোকন—[সাহস দেখিয়ে]—

"ভয় করো না মাগো,
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।"

মা চল, তুমি পাল্কীতে চড়ো, আমরা এগিয়ে যাবো। চল—[বেহারাদের বলল] এগিয়ে চলি। [সকলে চলে গেল, আলো নিভে গেল]

ফটো : অনিল দত্ত

[আলো আবার জ্বললে দেখা যাবে একটা বট গাছ—তার ধারে একটি মন্দির, তার সামনে ষণ্ডা গুণ্ডা চেহারার কয়েকজন লোক। ওরা ডাকাত]

১ম ডাকাত—[উঠে দাঁড়িয়ে নাচার ভঙ্গীতে]

"জয় জয় জয় কালী মাইকী জয়,
অসুর মারা খাঁড়া ধরা
যমকে দেখায় ভয়।
জয় জয় জয় জয়।।"

[সবাই তার সংগে জয় জয় জয় জয় বলে যোগ দিল। তারপর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল]

ডাকাত সর্দার—(প্রবেশ করে) এই, সব তৈরী হয়ে নে। সাঁঝের আঁধার একটু ঘনিয়ে এলেই লুটতে কাড়তে বেরিয়ে পড়ব।

২য় ডাকাত—

ঠিক যাবো ঠিক্
আমরা অন্ধকারে ভয় করি না
যাই না ভুলে দিক।

৩য় ডাকাত—

হাতে সবাই নেরে
যে যার লাঠি —[লাঠি দিল]
ছেড়ে যেতে হবে
এবার ঘাঁটি
ঝাঁকিয়ে নিয়ে মাথার ঝাঁকড়া চুল
কানে গুঁজে রাঙা জবার ফুল

[ফুল গুঁজে নিল]

তারপরে চল ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেড়ে
কিম্বা না হয় মাথায় লাঠি মেরে
লুটে নিয়ে আসবো টাকাকড়ি।

সব ডাকাত—(একসংগে)

একেবারে সাবাড় করে দেবো
তখন যদি করে কেহ বাধা।

সর্দার ডাকাত—চল, চলে যাই রাত যাচ্ছে বেড়ে

সকলে—হারে-রেরে-রেরে।

[ডাকাতরা চলে গেল। আলো নিভে গেল।]

[স্টেজ অন্ধকার। পর্দায় দেখা গেল, বেহারারা পাল্কী কাঁধে আসছে। আলো জ্বলে উঠল। খোকন দাঁড়িয়ে আছে। বেহারাদের ডেকে বলল]

খোকন- এদিকে পাল্কী নামাও।

[বেহারারা পাল্কী নামিয়ে বসে বিশ্রাম নিল, গামছায় হাওয়া খেল। মা পাল্কী থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর পাশের দিকে এগিয়ে গিয়ে কী যেন দেখলেন,—খোকনও]

মা—"চোর কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে
গরুবাছুর নেইক কোনখানে
সন্ধ্যে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে।"

বেহারারা—"আমরা কোথায় যাচ্ছি তা কে জানে
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।"

মা—[খোকনকে ডেকে]—
"দিঘীর ধারে ঐ যে কিসের আলো।"

১ম বেহারা—[সেদিকে তাকিয়ে]—
সাবধান সব সাবধান ভাই
ডাকাতরা যে এলো।

[ডাকাতদের চীৎকার—হারে—রেরে—রেরে।]

খোকন—মা পাল্‌কীর মধ্যে যাও। **[মা পাল্‌কীর মধ্যে গেল]** "ভয় কেন মা কর।"
[বেহারাদের] তোরা দেখছি ভয়েই জড় সড়।
(স্টেজের আলো কমে গেল।)

[ডাকাতরা স্টেজের মধ্যে এল। হারে—রেরে—রেরে শব্দ করে]

বেহারা—**[ভয়ে বলল]**—আমাদের মেরো না। দোহাই তোমাদের। **[সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেল]**

ডাকাতরা—
হারে—রেরে—রেরে।

ডাকাতসর্দার—
এই পাল্‌কীতে যাচ্ছে কেরে।
ভালোয় ভালোয় দিয়ে দে, যা আছে
নইলে তোদের ফেলবো মেরে।

খোকন—**[এগিয়ে এসে]**—
"দাঁড়া খবরদার
এক পা কাছে আসিস্ যদি আর-
[তলোয়ার বার করে]—
এই চেয়ে দ্যাখ আমার তলোয়ার
টুকরো করে দেবো তোদের সেরে।"

মা—**[পাল্‌কীর মধ্য থেকে]**—
"যাস নে খোকা ওরে।"

খোকন [মায়ের দিকে তাকিয়ে]—
"দেখোনা চুপ করে।"

[খোকন আর ডাকাতদের লড়াই, মায়ের নিষেধ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা। কিছুক্ষণ লড়াই চলল। দু' একজন ডাকাত ঘায়েল হতেই ওরা পালিয়ে গেল। খোকন ওদের তাড়া করে নিয়ে গেল]

মা [পাল্‌কী থেকে বেরিয়ে এসে]—
খোকন বাবা ফিরে আয়—
এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে
খোকন আমার আর কি বেঁচে আছে।

খোকন [হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল]—
মাগো লড়াই গেছে থেমে
তাই ত ফিরে এলেম তোমার কাছে।

মা [খোকনকে কাছে টেনে আদর করে.—সকলের দিকে তাকিয়ে]
"ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হ'ত না তাহলে।

বেহারারা [বেরিয়ে এসে আনন্দে]—
বীর দাদাবাবু
সাবাস দাদাবাবু
জয় দাদাবাবু॥

[স্টেজের আলো নিভে গেল]

[স্টেজ তখনও অন্ধকার। পিছনে পর্দার ছায়া—শুধু কতগুলো প্রশ্নবোধক চিহ্ন। পিছনে মাইক্রোফোনে কথার আওয়াজ]

মাইক থেকে—
"রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।"

[স্টেজে আলো। আবার প্রথম দৃশ্য। খোকা মার কোলে বসে]

খোকন—ভয় পাওনি ত মনে
মাগো আমার এ গল্পটা শুনে।

দাদা—আমি মার পিছনে দাঁড়িয়ে তোর গল্পটা শুনেছি
" খোকার এ গল্পটা
মিথ্যা একেবারে।
খোকা কি এতই [illegible]
ডাকাতগুলোর
হারিয়ে দিতে পারে!
ওর গায়ে কি
অত জোর মা আছে?

মা [খোকনকে আদর করে আরো কাছে নিয়ে] "ভাগ্যে খোকা ছিল আ[illegible] কাছে

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তালগাছ' ও 'বীর-পুরুষ' অবলম্বনে]

হায় ডিনোসার!

রেবতীভূষণ ঘোষ

হায় হায় ডিনোসার
দেখা তো পাইনে আর
বলা কওয়া নেই, কোথা গেলি
বল দিকি!

সেদিনও তো ছিলি ভবে
দুকোটি বছর হবে
(না হয় আড়াই কোটি
জানিনে তা ঠিকই)

ছিলি জলা জঙ্গলে
দঙ্গলে দঙ্গলে
আজকাল দেখি না তো
আর তোর টিকি!

ওঃ হরি ছিলেস ভুলে
দেয়ালে আছিস ঝুলে
বিধির খেয়ালে তুই-ই
হয়ে টিকটিকি!

ঘাতকরূপে ঘোঁতনদা

জীবন ভৌমিক

ঘোঁতনদা, তুমি যেখানেই থাক চলে এস। তোমাকে ছাড়া এবার আমাদের থিয়েটার বন্ধ।—ইতি জগঝম্প ক্লাবের সদস্যবৃন্দ।'

খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেবার পরই ঘোঁতনদা একদিন এসে হাজির। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল—'কী বই হচ্ছেরে?'

পিকলু বললে—'হুতমপুরের সিংহাসন।'

'অ,'

'তোমাকে জহ্লাদের পার্ট করতে হবে।' পিকলুর মুখে এই কথা শুনে ঘোঁতনদার চোখে মুখে একটু যেন আহ্লাদ ফুটে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবী জহ্লাদের আহ্লাদ চটে গেল। ঘোঁতনদা গর্জন করে উঠল—'কেন? জহ্লাদ কেন? আমার জন্যে জহ্লাদের পার্ট কেন!'

আগের বছর আমাদের জগঝম্প ক্লাবের 'রাজা গর্জন কুমার' পালা হয়েছিল। ঘোঁতনদা গর্জনকুমারের পার্ট করেছিল। প্রথম সীনটা ছিল এই রকমঃ—

রাজা গর্জনকুমার গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর এক রাজকন্যা এসে তার হাতের জাদুকাঠি যেই মাত্র রাজার শরীরে ছোঁয়াবে অমনি তার ঘুম ভেঙে যাবে। ঘোঁতনদাকে রাজা গর্জনকুমার খাসা মানিয়েছিল। অবশ্যি টিউব দিয়ে বেঁধে ভুঁড়ি খানা চেপে দেওয়া হয়েছিল।

পর্দা উঠতে দেখা গেল ঘন জঙ্গলে পথ হারিয়ে রাজা গর্জনকুমার ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গর্জনকুমারের নাসিকা-গর্জন আরম্ভ হল। রাজকন্যা এসে ঘুমন্ত রাজার শরীরে তার জাদুকাঠি ছোঁয়াল। একবার—দুবার—তিনবার! কিন্তু এ-কি! রাজা ত জেগে উঠছে না। রাজকন্যা অর্থাৎ পিকলু যে কী করবে ভেবে পেল না। ঘোঁতনদা জেগে না উঠলে পিকলু তার ডায়ালগ বলতে পারছে না। পিকলু তখন জাদুকাঠি দিয়ে ঘোঁতনদাকে খোঁচাতে আরম্ভ করল। রাজা গর্জনকুমার সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল। পিকলুর খোঁচাখুঁচিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। এবং জেগে উঠেই পিকলুর গালে কষে এক চড় বসিয়ে দিল।

রাজকন্যার গালে চড়! সেই দেখে দর্শকেরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। সে এক বিতিকিচ্ছী ব্যাপার। তাড়াতাড়ি পর্দা ফেলে দিতে হল। জগঝম্প ক্লাবের থিয়েটার সেবার ঘোঁতনদার জন্যেই পণ্ড হল।

তারপর থেকে ঘোঁতনদা একদম বেপাত্তা। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ ঘোঁতনদাকে ছাড়া চলবেও না। কারণ এবারের পালায়

'চৌপ' বলে ঘোঁতনদা আবার আরম্ভ করল

ঘাতকের পার্ট ঘোঁতনদা ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবার নয়। ঘাতকের পার্ট করতে হলে চেহারা থাকা চাই। ঘোঁতনদার মত চেহারা ক'জনের আছে! অমন বাতাবি লেবুর মত মুখ, ফজলি আমের মত হাতের বাইসেপ্স আর পৃথিবীর মত ভুঁড়ি!

ঘোঁতনদা বলল—'ঘাতকের পার্ট করতে পারি, তবে ভাল ডায়ালগ্ চাই।'

আমি বললাম—'কথাবার্তা ছাড়া অ্যাকটিং করাই ত শক্ত। তুমি ছাড়া আর কারুর দ্বারা—

'থাম ন্যাড়া, তোকে আর প্যান প্যান করতে হবে না।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলাম। ঘোঁতনদাকে চটানো আমার ঠিক হবে না। কারণ এবারের থিয়েটারে ঘাতকরূপে ঘোঁতনদার আমাকেই বধ করবার কথা। চটে থাকলে সত্যি সত্যি বধ করে দিতে পারে।

যাইহোক শেষ অবধি ঘোঁতনদা ঘাতকের পার্ট করতে রাজী হল। তবে একটা শর্তে। ঘোঁতনদা কোনও রিহার্সাল দেবে না। একটা ত মাত্র সীন। লবঙ্গরাজ যখন 'ঘাতক' বলে ডাকবে তখন ঘোঁতনদা মঞ্চে এসে হাজির হবে এবং আমাকে অর্থাৎ বন্দী সিংহাদিত্যকে বধ করবার জন্যে ধরে নিয়ে যাবে।

থিয়েটারের দিন ঘোঁতনদা সময় মতই মেক্ আপ টেক্ আপ নিয়ে তৈরী হয়েছিল। পরনে একটা ছোট্ট লাল লুঙ্গি, মাথায় বড় বড় চুল আর সারা গায়ে ঘাম তেল মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভুঁড়িখানা বারো নম্বর ব্লাডারের মত। হাতে একখানা বল্লম।

তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত নাটক বেশ জমেছে। হুতমপুরের সিংহাসন নিয়ে দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ। শেষে লবঙ্গরাজের হাতে সিংহাদিত্য বন্দী হল। চতুর্থ দৃশ্যে দেখা গেল সিংহাসনে লবঙ্গরাজ পিকলু বসে আছে। টোগড়ে আর বিলে আমাকে ধরে নিয়ে ওর সামনে দাঁড় করালে পিকলু ডাকল—'ঘাতক!' তখনই মঞ্চে ঘোঁতনদা এসে দাঁড়াল। ঘোঁতনদার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু তবুও ঘোঁতনদা বলল—'কে বলে ঘাতক আমি।' এই কথা বলে ঘাতক-রূপে ঘোঁতনদা মঞ্চের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি মুখস্ত বলতে লাগল। আমি আর পিকলু দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম। শেষে এক সময় লবঙ্গরাজ পিকলু চীৎকার করে উঠল—'ঘাতক' বলে।

'চৌপ্!'—বলে ঘোঁতনদা আবার আরম্ভ করল—'আমি ঢালিব করুণাধারা আমি ভাঙিব পাষাণ কারা—

অগত্যা পর্দা ফেলে দেওয়া হল। দর্শকবৃন্দের হাততালি শুনে ঘোঁতনদা বলল—'একে বলে অ্যাকটিং—বুঝলি।'

ঢোলের ছড়া

মনীষ বসু

ঐ শোন্, বাজে ঢোল,
এলো দোল, এলো দোল।
ফাগুনের হিন্দোল,
বয় রং-কল্লোল।
খোকা-খুকু ব্যথা ভোল,
হেসে সবে রং গোল।
রং-রংয়ে ভরে তোল
এ বাংলা, এ-ভূগোল।
কর্ সবে ঝল্-মল্,
উজ্জ্বল, উচ্ছল।
চাপা-মন দ্বার খোল,
হেসে বল্ মধু-বোল।
মধুবোল দিক দোল,
হোক প্রাণ চঞ্চল॥

টুনটুনি

ক্ষিতীশ সাঁতরা

টুনটুনি, খুব উড়তে পারো
যাও তো অনেক দূর,
পূব-পশ্চিম, সব দিকে তো?
দক্ষিণ? —উত্তর!

টুনটুনি, ভাই দেবো তোমায়
যা-যা তুমি চাও,
খবর একটা যদি আমার
সঙ্গে নিয়ে যাও।

কার কাছেতে? আমার পুষি—
সেই যে, নামটা? —'তালি,'
মাছ পায়নি, রাগ করে তাই
পালিয়ে গেছে কালই।

ও হ্যাঁ, তাকে কি বলবে?
বলবে হ'লে দেখা,
হারিয়ে তাকে, লাগছে আমার
বড্ড একা-একা।

হাসিবাবুর গল্প ■ রবিদাস সাহা রায়

হাসনাবাদের হাসিবাবুর গল্প যদি শুনতে চাও,
কি বিচিত্র মেজাজটা তার আগে সেটির খবর নাও।
দিনে রাতে কখনো তার কেউ দেখেনি মুখটি ভার,
দাঁতের ফাঁকে ঠোঁটের বাঁকে হাসি লেগে থাকেই তার।
মাথা জুড়ে আছে বটে চকচকে এক মস্ত টাক,
দুঃখ তাতে নাইকো মোটে বরং আছে বেশ দেমাক।
হাসিবাবু বলেন হেসে, টাকটি মাথায় আছে তাই
এই বেয়াড়া বাজারেতে চিন্তা থেকে রেহাই পাই।
তেলে ভেজাল—বাড়ছে যেমন, দামও তেমন বাড়ছে তার,
আমি আছি বেশ আরামে তেল লাগে না মাথায় আর।
মাসে মাসে চুল কাটতে পয়সা খরচ কম তো নয়,
নেইকো আমার সেই ভাবনা, চুল মোটে না কাটতে হয়।
পথেঘাটে মারামারি লেগেই আছে সারাক্ষণ,
ধরলে চুলে জব্দ ভারী হয় দেখি সব বাছাধন।
তেমন করে জব্দ আমায় বলো দেখি করবে কে,
চুল নেইকো চুলের ঝুঁটি কায়দা করে ধরবে যে!
টাকটা থাকার অনেক মজা, বলবো কতো, এখন থাক্
শুনলে শেষে আমার মত সবাই মাথায় চাইবে টাক।

বোঝা গেল কারণ এবার হাসিবাবুর দেমাকটার,
বলিহারি বুদ্ধি বাবুর, যুক্তিটা বেশ চমৎকার!

সাক্ষী ■ প্রভাকর মাঝি

'সাক্ষীমশাই, হারুবাবু',—বাঘা উকিল বলেন ওকে,
'বলুন হুজুরের নিকটে, যা দেখেছেন নিজের চোখে।
আপনি প্রধান সাক্ষী আছেন, বলুন ভেবে—নেই কো তাড়া,
ন্যায়বিচারের মর্যাদা দিন, দোষী যেন পায় না ছাড়া।

এ মামলাতে আপনি কেবল হাজির ছিলেন অকুস্থলে,
হক কথা যা, বলবেন তা—এখনও চাঁদ সূর্যি জ্বলে।
আজেবাজে ছেড়ে দিয়ে, যা খাঁটি তা বলুন, যাতে
হাকিম খুশী, রায় লিখে দেন ন্যায়-বিচারের প্রতিষ্ঠাতে।

সমাজ হয়ে যায় নি তো বন, যার জোর তার মুলুক তো নয়—
আইন আছে, শাসন আছে, এখানে তার দিন পরিচয়।
কথা কাটাকাটির থেকে কে কার গায়ে তুলেছে হাত,
পবিত্র কর্তব্য করুন—যা মিথ্যা তা হোক কুপোকাৎ।
পঞ্চু জানা, বাঁকু বোসের কে দোষী সব জানুক লোকে,
নির্ভয়েতে বলুন সকল, কি দেখেছেন নিজের চোখে।'

'নির্ভয়েতেই বলছি, হুজুর',—বললে হারু হলপ নিয়ে,
'চোখে কিছুই দেখি নি তো, দেখেছিলাম চশমা দিয়ে।'

দোলের দিনে রঙ খেলতে সবাই পগার পার,
টমি কুকুর তাই নিয়েছে কুটনো কোটার ভার।
ফটো ঃ কল্যাণ সরকার

আপাস ■ হাসিরাশি দেবী

পাড়ায় ছিল এক যে খোকা, বয়স হবে আশি
ভিন্-পাড়াতে থাক্‌তো তারই নড়বড়ে এক মাসী;
খোকার মাথায় চুল ছিল না, মাসীর মাথায় ঢাক,
নাকটা ছিল চ্যাপ্টা খোকার, মাসীর খাঁদা নাক;
দুইজনে একবার,—
চোখা কথায় তর্ক হল, সাক্ষী আছে তার।

বললে মাসী—চুপ করে থাক,—
আমার কাছে করিসনে জাঁক,—
তোর বয়সের গণ্ডি আমার গেছে অনেক কাল—
একশো বছর পেরিয়ে এলাম, পাঁচকুড়ি-ছয় সাল।
খোকা বলে—ধেৎ! এতে আর হল এমন কি?
কল্‌কাতাতে টেরাম হওয়া,
ফুশফুশিতে কথা কওয়া
আমিই সেবার প্রথম দেখেছি।
আর দেখেছি—হাওড়া সেতু বাঁধা,
পিচ গালিয়ে ঢালতে পথে, ঢাকতে ধুলো কাদা!

মাসী বলে—দূর! এটা তোর কেবল বাড়াবাড়ি,
আমার দেখা যত গোরা লাখ-বেলাখ পাল্টনেরা
তোদের মানুষ হবার আগেই গোটাল পাততাড়ি।
খোকা বলে—ধেৎ! এটা কি কথার মত কথা—!
নতুন কিছু তথ্য হলে থাকতো গভীরতা।

এই দেখনা আমার কালে হরিণঘাটা থেকে
বোতল ভরে আসছে যে দুধ দেখতে পার চেখে!
লবণ হ্রদের মাটি সবাই কিনছে মুঠো মুঠো
আসল মণি-মুক্তো ফেলে কিনছে নকল ঝুটো।

আকাশ থেকে দেখতে পাবে, খোপের মত বাড়ি,
কলকাতাটা জুড়ে আছে ঝুলন্ত রেলগাড়ি
আরও একটা প্ল্যানে আছে, শহর কলকাতাতে—
মানুষগুলো উড়বে শুধু দিনে কিংবা রাতে।

অনেক ভেবে বললে মাসী—যাক্ গে ওসব তর্ক,
মুখোমুখি দেখাই হলো, রইল বাকি স্বর্গ।

তোমরাও তৈরী করতে পার

সুনীল সরকার

আজকাল খাঁটি দুধ প্রায় এক রকম পাওয়া যায় না বললেই চলে—এমন কি, দেড়টাকা কেজি দুধেও জল মেশানো থাকে। আর তার নীচে হলে তো কথাই নেই. দুধ আর জলের পরিমাণ সমান সমান। তবে এই পরিমাণটা আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র। প্রকৃত পক্ষে কতটা জল গোয়ালারা মেশায় তা আমরা জানতে পারি না। কারণ, জানতে গেলে দরকার যন্ত্রের। অবশ্য এরকম একটি যন্ত্র অনেকদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে—নাম ল্যাক্টোমিটার। এটি সাধারণত গবেষণাগারে পাওয়া যায়। কিনতেও পাওয়া যায়. তবে দাম খুব কম নয়। সে জন্যেই সকলের বাড়িতে এটি থাকে না। অথচ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন কি অন্যভাবে মেটানো যায় না? যায়. অর্থাৎ এমনি একটি যন্ত্র তোমরা নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারো এবং বাড়িতে বসেই। কেমন করে:

ল্যাক্টোমিটার

কাচের তৈরী এক মুখ বন্ধ একটি ফাঁপা নল যোগাড় করো। সেই নলের নীচের দিকটা গোলাকার হলেই ভাল হয়। নলের ভিতরে নীচের গোলাকার জায়গাটাতে অল্প একটু সীসা ফেলে দাও। সীসার পরিমাণটা এমন হওয়া চাই যাতে করে নলটা সোজা দাঁড়িয়ে থেকে ভাসতে পারে। ভিতরে সীসা ফেলে দেবার পর, একটি কর্ক বা ছিপি দিয়ে নলের উপরকার মুখটা সেঁটে দাও। তারপর ছুঁচলো-ধারালো কোন কঠিন অস্ত্র দিয়ে নলের গায়ে থার্মোমিটারের মত সম পরিমাণ দাগ কেটে নাও। ব্যস, হয়ে গেলো ল্যাক্টোমিটার যন্ত্র!

এবার একটি ছোট্ট বালতিতে খাঁটি দুধ ঢেলে নিয়ে দুধের মধ্যে নলটা ছেড়ে দাও। আর দুধের উপরের তলে যে দাগটা এসে দাঁড়ালো, তা লক্ষ্য রাখো বা টুকে রাখো। নলটা তুলে নাও এবং অন্য একটি পাত্রে রাখা জলে ভাসাও। দুধের চেয়ে জল হালকা। কাজেই নলটা আরো একটু বেশী নেমে যাবে। খাঁটি দুধে কোন দাগ অবধি নামলো তা টুকে রাখলে। গয়লা দুধ দিয়ে গেলো, তাতে নলটা ছেড়ে দিলে। দেখলে, বেশী নেমে গেল। তবে নিশ্চয়ই বুঝবে গয়লা দুধে জল মিশিয়েছে। আর যত বেশী নামবে তত বেশী জল মিশিয়েছে—বুঝতে হবে। এবার খাঁটি দুধের দাগ আর গয়লার দুধের দাগের ব্যবধানটা বার করলেই পেয়ে যাবে কতটা পরিমাণ জল সে মিশিয়েছে—তাই না? তবে হ্যাঁ, গয়লা যদি জল ঢেলে উপযুক্ত পরিমাণ চিনি মিশিয়ে দুধের ঘনত্ব ঠিক রাখে.—তাহলে কিন্তু জল মেশানো হয়েছে কিনা, ধরতে পারবে না।

প্রশ্ন

ছড়া ও ছবি: সুদর্শন চক্রবর্তী

(১) র‍্যাকের চালে খেয়ে ভাত
বেঁচে আছে বাঙালি জাত।

(২) ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর কাঁদে
ভেঙেছে তার দাঁতের গোড়া,
চাল চিবিয়ে বলে কেঁদে
মানুষ কি খায় শিল আর নোড়া?"

(৩) মাছ কিনে খায় ঝোলে ঝালে
ছেলে বুড়ো পালে পালে।

(৪) লেজটি তুলে পালায় হুলো
বলে গন্ধে টেঁকা দায়,
মাছগুলো কি ভীষণ পচা
কি করে যে মানুষে খায়?

(৫) এক টাকা সের কিনে খাঁটি
দুধ খায় বাটি বাটি।

(৬) প্যাঁক প্যাঁকিয়ে বলল হাঁস
দিন কাল কি হল হায়,
এক সের দুধে তিন পো জল
মানুষগুলো টের কি পায়?

মেডিটেশন মানে ধ্যান

সুজিত ধর

কাকাবাবু একটু সন্ন্যাসী টাইপের লোক। মার মুখে অনেক গুণগান শুনেছি। শুনেছি, কাকাবাবু মস্ত দেহী, ইয়া মোটা ধরনের লোক। ভুঁড়ি পর্যন্ত কাঁচাপাকা দাড়ি। আকর্ণ বিস্তৃত লাল লাল ভাঁটার মত চোখ। সে চোখে প্রগাঢ় এক তন্ময়তা থাকার জন্য নাকি তাকানই যায় না। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লাল কাপড় লুঙ্গির মত পরেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবা বলতেন—"তোর কাকু না প্রথম জীবনে একজন টেরিফিক টাইপের শিকারী ছিলেন। একবার নাকি একটা বাঘের পেছনে সাতদিন নুন খেয়ে ঘুরেছিলেন। শেষে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন। কিন্তু ফায়ার হয়নি। আসল ব্যাপারটা যখন জানতে পারলেন ততক্ষণে বাঘটা হালুম শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বনামধন্য শিকারী কাকু শেষ পর্যন্ত বাঘটাকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিলেন। ফায়ার হয়নি কেন জানতে চাইলে বাবা বলতেন—"কাকু নাকি বন্দুকের ভিতর টোটা ভরতেই বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

সেই কাকুই আজকে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। আমার ছোট বোন পাপড়ি এসে খবর দিল—'দাদা, কাকু তোমাকে ডাকছেন।' ঘরে ঢুকতেই কাকুর বাজখাই গলা ভেসে আসে—'তুমিই বিনু?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'কোন ক্লাসে পড়?'

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম—'সেভেন।'

আমার কথা শুনে কাকুর কি হাসি। হাসির সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে। হাতের উলটা পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাবাকে বললেন—'বড়দা তোমার ঐটুকুন পোলা ক্লাস সেভেনে পড়ে?' তারপর উনি যেন চরম বিস্মিত হয়েছেন—মুখের মধ্যে এমন একটা ভাব এনে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন—'এ্যাঁ, কয় কি?'

কাকুর সামনে দাঁড়াতে পারছি না। ওদিকে পচা, শঙ্কর আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সকাল বেলায় আমরা তিন জনে মিলে একটা দুঃসাহসিক প্ল্যান ছকেছি। রায়েদের বাগান-বাড়ির পেয়ারা গাছটার পেয়ারাগুলো পেকেছে। সেগুলো সাবাড় না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। এদিকে কাকু এসে কি হুজ্জুতটাই না বাধালো।

'তুমি মেডিটেশন জান?'

আমি হাঁ করে কাকুর দিকে তাকালাম। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি—'সেটা আবার কি?'

'ক্লাস সেভেনে পড়ছো. মেডিটেশন জান না?'—কাকু যেন আকাশ থেকে পড়লেন—আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—মেডিটেশন হচ্ছে ইংরেজি কথা। মেডিটেশনের বাংলা মানে হচ্ছে ধ্যান। দুই ভুরুর মাঝে মনটাকে স্থির করে রাখতে হয়। মনটাকে স্থির করে রাখতে পারলে জগতের কোনও কাজই দুঃসাধ্য মনে হবে না। কাকু আরও ভালভাবে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললেন—মনটা হচ্ছে সূর্যের আলোর মত বিক্ষিপ্ত। মনকে কেন্দ্রীভূত করার নামই নাকি যোগ। কাকু উদাহরণ দিলেন—"এমনিতে সূর্যের আলোতে কোনও দাহিকাশক্তি নেই। মোটা লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করলেই দাহিকাশক্তি এসে হাজির হয়। সেরকম......।

'আকাশে ওড়া যাবে?' —ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করলাম আমি।

কাকু হো হো করে হেসে উঠলেন। মা বাঁশের চোঙা দিয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছিলেন। বাবার চোখ দুটো তীব্র সার্চ লাইটের মত মুখের সামনে-ধরা খবরের কাগজটার উপর ঘুরছে।

'কি হল সুখেন?'—খবরের কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে বাবা প্রশ্ন করলেন।

আমার কথা শুনে কাকুর কি হাসি

বাবার কথার উত্তর না দিয়ে কাকু মাকে বললেন—'ও বৌদি, তোমার পোলার কথা শোন। ছেলে কয় কি? অ্যাঁ!' আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—'কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে ধ্যানে বসবে।' আমি মাথা নাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। চৌকাঠে পা দিতেই কাকু বাবাকে বললেন—'দাদা, ভোর রাত্রে বিনুকে একটু ড্যাইক্যা দিও তো।'

বাবা হাসলেন। 'ও তোমার কাছেই শোবেখন।'

ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। তখনও পাতলা অন্ধকার সজনে পাতা থেকে চুয়ে পড়ছিল। হিজল গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ রাত্রের চাঁদটা নুয়ে পড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কাকু আমাকে ঘুম থেকে তুললেন। বললেন—'যাও, মুখে জল ছিটিয়ে এস।'

কাকুর গলাটা কেমন ভারী ভারী লাগছিল। ঘুম থেকে উঠলেই গলাটা ভারী ভারী শোনায়। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। ভীষণ গরম ছিল। ঘাম হচ্ছিল না বলে শরীরের মধ্যে অস্বস্তি। মুখ ধুয়ে দেখি কাকু যোগে বসে গেছেন। কাকুর কাছে যেতেই পা দুটো পদ্মাসনের ভঙ্গি করে বসতে বললেন।

বসলাম। এবার কাকু তর্জনী-আঙুলটা আমার দুই ভুরুর মাঝখানে ঠেকিয়ে বললেন—'মনটা এখানে স্থির কর। কোনও ভয় নেই। একটুও শব্দ করো না। চোখ একদম খুলবে না।'

কাকুর দৃঢ় কণ্ঠস্বর আমার গায়ের উপর বরফ টুকরোর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি চোখ বন্ধ করলাম...দশ মিনিট পনের মিনিট ...আধ ঘণ্টা কেটে গেল। দুজনের মধ্যে নিথর নিঃশব্দতা। বাঁশ বনের ভিতর থেকে শালিক পাখিগুলো কিচির মিচির করে ডেকে উঠল। কানের কাছে মশা ভোঁ ভোঁ করছে। একটা মাল বোঝাই গরুর গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। তেল-বিহীন চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ বিশাল এক মূর্চ্ছনা হয়ে ঝরে পড়ছে। আমি ভয়ে ভয়ে চোখ খুলতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলাম—ও হরি! দেখি কাকু গভীর ঘুমে অচেতন। হাতটা অলস ভঙ্গিতে খাটের নীচে ঝুলছে। আর একটু পাশ ফিরলেই মাটিতে ধপাস করে পড়বেন। আমি কাকুর গায়ে হাত ছোঁয়াতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন—মুখটা কেমন কাচুমাচু করে বললেন—'বিনু, তুই ঠিক সময়তেই ডেকেছিস। আর একটু দেরী হলেই আমি সমাধি লাভ করতাম।'

বোঝা যায়

লক্ষ্মীকান্ত রায়

রান্নার গুণাগুণ বোঝা যায় ভোজনে,
শরীরের ভার কত বোঝা যায় ওজনে।
মেঘ দেখে বুঝি তাই, এলো ঐ বরষা—
বিপদেই বোঝা যায় কার কত ভরসা।
বয়সটা বোঝা যায় গোঁফ, দাড়ি দেখে যে,
বহু কিছু বোঝা যায় পদে পদে ঠেকে যে।
কোকিলের কুহুকুহু, ভ্রমরের গুনগুন—
শুনে তাই বোঝা যায় এলো বুঝি ফাল্গুন।
কাঁচা আর পাকা ফল বোঝা যায় রঙেতে—
সব কথা বোঝা যায় বলবার ঢঙেতে।
জিভ দেখে অসুখটা বুঝে নেয় ডাক্তার,
পসারেতে বোঝা যায় কত নাম ডাক তার।
গোঁফ দেখে বোঝা যায় বেড়ালটা শিকারী—
চাইবার কায়দায় বোঝা যায় ভিখারী।
এত বোঝা মাথাটায় কাজ কিবা চাপিয়ে—
বেশী বুঝে কাজ নেই ঘিলু যাবে শুকিয়ে।

মঠ-মুড়াকর দেশে

ছড়া : বিমল ঘোষ

ফটো : রেবন্ত ঘোষ

বিলু, তপু রঙের খেলায় পড়ল যখন এলে
গোপা এসে তাদের কানে আজব খবর দিলে।
চিনির গড়া মঠ-কদমা মুড়কি কড়াই মুড়ি
এসব দিয়ে তৈরী সে দেশ—চল না রে যাই উড়ি?
অমনি তারা তিনজনে ভাই—রঙখেলা বাদ দিয়ে
হাজির হলো মিষ্টি-দেশে স্বপ্ন চোখে নিয়ে।

দেখল গিয়ে, চিনির গড়া মঠগুলো যে
সেথায় আকাশ ছোঁওয়া
মুড়ি মুড়কি কদমাগুলোও যায় না হাতে নেওয়া।
তপু গোপা মঠের নীচে,—বিলু কদমার খোলে
খুঁটে ভেঙে যেটুকু পায়—সেটুক মুখে তোলে।
জানতে কি কেউ দোলের দিনে এমন কাণ্ড ঘটে!
ফটো দেখে বলতে হবে—সত্যিতো তাই বটে!

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১
আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক : শ্রীঅশোককুমার সরকার।